ডিসেম্বর ২০১৮ ❑ অগ্রহায়ণ - পৌষ ১৪২৫

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

বিজয় ফুল উৎসব

রাইয়ান কামাল, ১ম শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

তাহমিদ নূর ইভান, ৩য় শ্রেণি, ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ভোলা

সম্পাদকীয়

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে বাংলাদেশের মানুষ ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার টকটকে লাল সূর্যকে। পাকিস্তানকে অতীত করে বাংলাদেশের সবুজ জমিনে ফুটে উঠল বিজয়ের ফুল।

বন্ধুরা, তোমরা তো মেতে উঠেছ বিজয়ের আনন্দে বিজয় ফুল উৎসবে। দেশব্যাপী স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা বিজয় ফুল তৈরির পাশাপাশি গান-আবৃত্তি-অভিনয়-ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা করছ। এই বিজয়ের মাসেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে পুরস্কার পাবে সেরা প্রতিযোগী। অভিনন্দন তোমাদের সবাইকে। সবাই তো আর সেরা হতে পারবে না। তবে, বিজয় ফুল উৎসব কিন্তু তোমাদের সবাইকেই সেরা বানিয়ে দিল। এরকম করে বিজয় ফুল দিয়ে পুরো দেশকে মাতিয়ে দিতে তো তোমরাই পেরেছ, তাই না?

সূচি

নিবন্ধ

২ নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর/সাদিয়া ইফ্ফাত আঁখি
২০ ঢাকার পথে বিজয় ফুল/শাহানা আফরোজ
২৩ শুভ জন্মদিন 'নবারুণ'/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
২৬ কিছু প্রাণের স্বপ্ন : পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ মো. তোফাজ্জল হোসেন
৪১ রহস্যময় স্থাপত্য/ খালিদ বিন আনিস
৪৯ যে খাবারে বুদ্ধি বাড়ে/ মো. জামাল উদ্দিন
৫০ কৃষ্ণবিবর কী: মহাকাশের সুড়ঙ্গ/ সানাউল্লাহ আল-মুবীন
৫৯ নেই অহেতুক সংকোচ/জান্নাতে রোজী
৬৩ শুভ বড়ো দিন: স্বাগতম ২০১৯/ মেজবাউল হক
৬৪ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

গল্প

০৮ মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি/ আবুল কালাম আজাদ
১১ পাঞ্জাবি মারুম/ মিয়াজান কবীর
১৩ বিজয়ের উল্লাসে/ তাজিয়া কবীর
১৫ বড়ো মুক্তিযোদ্ধার দিনলিপি/ রেজাউন নবী রেজান
১৮ গল্পটা দাদুর/ অদ্বৈত মারুত
২১ বিজয় ফুল/ মোহাম্মদ অংকন
৩৩ আর দেখা যায়নি/ সৈয়দা নাদিয়া হক
৩৬ আলু কাহিনি/ কৃণন মাহমুদ নিয়োগী
৩৭ জিরাফের ছানা চিউ/ সুমাইয়া বরকতউল্লাহ্
৩৯ নখের খোঁচা/ অবনিল আহমেদ
৪০ সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণ/ ফারহান তৌহিদ
৪৩ হাতির বিপদ/ রকিবুল ইসলাম
৪৫ বোকা রাজার কাণ্ড/ ইসহাক খান
৫৫ শেয়ালের শাস্তি/ হারুন রশীদ
৫৮ পাগল আজুবামাল/ রাকিবুল রকি
৬০ লটারি/ এশরার লতিফ

প্রধান সম্পাদক: মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন **সিনিয়র সম্পাদক:** মোঃ এনামুল কবীর **সম্পাদক:** নাসরীন জাহান লিপি
সহ-সম্পাদক: শাহানা আফরোজ, মো. জামাল উদ্দিন
সম্পাদকীয় সহযোগী: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা, মেজবাউল হক, সাদিয়া ইফ্ফাত আঁখি
সহযোগী শিল্পনির্দেশক: সুবর্ণা শীল **অলংকরণ:** নাহ্রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৮৫, **E-mail :** editornobarun@dfp.gov.bd, **ওয়েবসাইট:** www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ: সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০, **মূল্য:** ২০.০০ টাকা। **মুদ্রণ :** মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

কমিকস্

২৪ দাদুর খোকাবেলা/ আবু হাসান

কবিতার হাট

০৩ আমীরুল ইসলাম/রহীম শাহ্/নওশিনা ইসলাম
০৪ শাফিকুর রাহী/নাহার আহমেদ
জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ
০৫ এস এম তিতুমীর/আমিনুল ইসলাম মামুন
রেদওয়ান মাহমুদ
০৬ খোরশেদ আলম নয়ন/আবেদীন জনী/রওশন মতিন
০৭ অঞ্জন মেহেদী/বাতেন বাহার/সাঈদ তপু
ফাতেমা জান্নাত
১৪ দেলোয়ার হোসেন
১৭ মোশররফ হোসেন ভূঞা
২৩ মোহাম্মদ আজহারুল হক
২৮ আতিক আজিজ/আব্দুল্লাহ নোমান
শাশ্বত ওসমান/ফারুক হাসান
২৯ স্বপন মোহাম্মদ কামাল/স্বপন শর্মা
৩০ লিয়াকত আলী চৌধুরী/ সামসুন্নাহার ফারুক
শরীফ আব্দুল হাই/হামীম রায়হান
৩১ চন্দনকৃষ্ণ পাল/মুস্তফা হাবীব
নাজমা বেগম
৩২ লিটন ঘোষ জয়/নেহা হোসেন/মনসুর
জোয়ারদার/মানসুর মুজাম্মিল
৪৪ শেকস্‌পীয়র কায়সার
৫৭ মো. আবীর আহমেদ

আঁকা ছবি

৬৩ অর্পিতা রায় বর্মণ

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত বিজয় ফুলের পেইন্টিং করেছেন ধ্রুব নীল
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: রাইয়ান কামাল, তাহমিদ নূর ইভান
শেষ প্রচ্ছদ: তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ

নবারুণ পড়

ওয়েব সাইট: www.dfp.gov.bd
ফেসবুক: nobarun potrika
মোবাইল অ্যাপ: Google Playstore থেকে 'Nobarun' Install করো।

বিকাশ ০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে গ্রাহক চাঁদা দিলেই বাড়ি পৌঁছে যাবে নবারুণ।

নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা নবারুণের জন্য লিখে পাঠাও বিভিন্ন গল্প, ছড়া, কবিতা। পাঠাও আঁকা ছবি। সমস্যার কথাও লিখ। ইতিবাচক কিশোর উপযোগী কোনো বিষয়ও তুলে ধরতে পারো। নবারুণ-এ প্রকাশিত লেখা নিয়ে পাঠাতে পারো তোমাদের মতামতও। পাঠিয়ে দাও ডাকযোগে, ই-মেইলে অথবা ফেসবুকে। নবারুণ তো তোমাদের জন্যই।

ফেসবুক মতামত

এডিবি মো. জালাল উদ্দিন: গাজীপুর জেলা তথ্য অফিসে পত্রিকা এত দেরিতে আসে কেন? অফিস বলে দুই/তিন মাস পর পর আসে। এটা কী সত্যি?

নবারুণ: নবারুণ মাসিক পত্রিকা মাস অনুযায়ী ঠিকমতো পৌঁছে যায়। আপনি আপনার সমস্যার জন্য ০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ করুন প্লিজ।

আরিয়ান খান মামুন: লেখা পাঠানোর বিভাগগুলো জানিয়ে দিলে খুবই খুশি হবো।

নবারুণ: প্রিয় লেখক, নবারুণ হলো সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা। কিশোর বয়সিদের উপযোগী যে-কোনো বিষয়ের লেখা কাম্য। ছড়া বা কবিতার ক্ষেত্রে সঠিক ছন্দে ৮/১০ লাইনের হলে ভালো হয়। আর অবশ্যই বড়োদের উপভোগ্য কবিতা বা লেখা পাঠাবেন না।

হুসাইন আল হাফিজ: ই-মেইল ঠিকানা কী?

নবারুণ: ই-মেইল: editornobarun@dfp.gov.bd

আব্দুর রহিম: ছোটোদের এক-দেড় পৃষ্ঠার গল্প দেওয়া যাবে?

নবারুণ: কেন নয়? মনোনীত হলে অবশ্যই ছাপা হবে।

আসমা আফরিন: লেখা পাঠাব কোন ঠিকানায়?

নবারুণ: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০

email: editornobarun@dfp.gov.bd
website: www.dfp.gov.bd
Facebook: www.facebook.com

বঙ্গবন্ধু

আমীরুল ইসলাম

আকাশ বলে বঙ্গবন্ধু
বাতাস বলে বঙ্গবন্ধু
পদ্মা বলে বঙ্গবন্ধু
মেঘনা বলে বঙ্গবন্ধু
পাখির মুখে বঙ্গবন্ধু
কাব্য গানে বঙ্গবন্ধু
বজ্রকণ্ঠে বঙ্গবন্ধু।

বীর বাঙালির প্রতীক তুমি
জাতির পিতা তুমি
তোমার জন্য বাংলাদেশ
প্রিয় জন্মভূমি।
তোমার জন্য দেশ পেয়েছি
লাল-সবুজের দেশে
আমরা সবাই মুক্ত পাখি
মুক্ত পরিবেশে।

চিরদিনের বঙ্গবন্ধু
শ্রেষ্ঠ তুমি বঙ্গবন্ধু
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
অমর তুমি বঙ্গবন্ধু।

বীরের ভয়ে

রহীম শাহ

উড়ছে বিমান ছুটছে মর্টার
ফুটছে জোরে বোমা
সকল কিছু ভেদ করে আজ
যাচ্ছে কে যে ও মা।

ঘোড়ার খুরের শব্দে ওঠে
দিগন্তরে ঝড়
ছুটছে মহানায়ক বুঝি
কাঁপিয়ে প্রান্তর।

শত্রুসেনা মরছে ভয়ে
আসছে দেখে বীর
বীরের হাতে ঝলকে ওঠে
ঢাল-তলোয়ার তীর।

বিমান মর্টার বোমা ফেলে
শত্রু গেছে ভেগে
দিগন্তরে বীর ছুটে যায়
তুমুল ঝড়ের বেগে।

বিজয় মাসে

নওশিনা ইসলাম

নয়টি মাস যুদ্ধ করি দেশকে ভালোবেসে
স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ পেলাম অবশেষে।

হার মেনেছে দেশ ছেড়েছে পাকিস্তানির দল
যুদ্ধ জয়ের শপথ নিয়ে দেশ গড়ব চল।

বাংলা আমার জন্মভূমি বাংলা আমার দেশ
এই দেশেতে মিলেমিশে থাকব সুখে বেশ।

বিজয় মাসে উঠব মেতে হাতে বিজয় ফুল
দেশের কাজে অংশ নিতে করব না তো ভুল।

৯ম শ্রেণি, দিঘলীয়া এ. জেড উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ফরিদপুর, পাবনা।

বীর কাহিনি

শাফিকুর রাহী

বীর বাঙালির বিজয় নিশান বীরের গর্ব গাথায়,
মেঘলাকাশে সূর্য হাসে বিপুল সম্ভাবনায়।
লক্ষ প্রাণের আত্মদানে জমিনে আসমানে,
রক্তবানে শোকাশ্রুতে অনন্ত উত্থানে
জয় বাংলার জয়োল্লাসে বইলো সুরের ধারা
সন্তানহারা বিরহিণীর হৃদয় পাগলপারা।
উনিশ'শ একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বরে
প্রাণের দোলায় উঠল নেচে সবারই অন্তরে।

বধ্যভূমির মাটি চাপায় লাশের উপর লাশে;
স্বজনহারার ব্যথা ভুলে আনন্দে মন হাসে।
আকাশ বাতাস জানায় সালাম লক্ষ শহিদানে,
বিশ্ববিবেক বিস্মিত হয় বীরের জীবন দানে।
বুকের মানিক হারার শোকে মা-বোনের বিলাপে
চারিদিকে কি হাহাকার; বুকভাঙা সন্তাপে!
এ বাংলায় সে গণহত্যার নির্মম নিদানকালে
কোটি মানুষ শরণার্থী ভারতের চাতালে-

গ্রামের পরে গ্রাম জ্বালাল পাকিস্তানি দানো-
সেই যুদ্ধে শহিদ হলো ত্রিশ লক্ষ প্রাণও
বিজয় মানে নদীর ঢেউয়ে নৌকো সারি সারি
মুক্ত হাওয়ায় জলপায়রা যাবে আপন বাড়ি
বিজয় মানে বীর তারুণ্য সম্মুখ পানে ছুটবে
আপনহারার দুঃখ ভুলে গোলাপ হয়ে ফুটবে।
বিজয় মানে আলোর নাচন করছে ঝিকিমিকি
শ্যামলিমা মায়ের বুকে পদ্মফোটা দিঘি।

মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস ধরে গণহত্যার কালে
বাতাস এসে থমকে দাঁড়ায় নায়ের বৈঠা পালে
স্বাধীনতার লড়াই শুরু- সুদীর্ঘ সংগ্রামে
কৃষক-শ্রমিক বীর তারুণ্য বিজয়ের উদ্দামে-
পিতার কণ্ঠে গর্জে ওঠে স্বাধীনতা আনতে
বীর গেরিলা ঝাঁপিয়ে পড়ে দূর পাহাড়ের প্রান্তে।
পুব-আকাশে রক্ত-রঙিন ভোরের সূর্য হাসে
দীর্ঘকালের ভাঙল আঁধার এই ডিসেম্বর মাসে।

বাংলাদেশের বিজয়

নাহার আহমেদ

ছোট্ট খানিক জায়গা নিয়ে
মানচিত্রে ঐ দাঁড়িয়ে
প্রিয় আমার দেশ
লাল-সবুজের পতাকা উড়ে
সবাই বলি গর্ব করে
সোনার বাংলাদেশ।
নয়টি মাসের যুদ্ধ শেষে
মুক্তিযোদ্ধা বীরের বেশে
স্বাধীন পতাকা নিয়ে
সবুজ মাটির আঙিনাতে
বিজয় মুকুট আনলো সাথে
অনেক রক্ত দিয়ে।

বাংলার জয়ধ্বনি

জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ

যুদ্ধের ঘটনায় শঙ্কিত দেশ
প্রতিরোধ খালি হাতে নাই পরিবেশ
আহ্বান তাই ছিল মুজিবের মুখে
আছে সেটা যার কাছে তাতে যাও রুখে।
বাঙালি দল বাঁধে ফেলে রেখে বাড়ি
হাতিয়ার সংগ্রহে লাগে তাড়াতাড়ি
সীমানায়ও থাকে নাই ভারতেই যায়
সেখানেই প্রশিক্ষণ ভালো করে পায়।
হানাদার বধ করে স্বাধীনতা চাই
যুদ্ধের শেষ সেই দেশটাকে পাই
এই দেশ আমাদের পতাকায় রবি
সবুজের ঢেউ খেলা দেশ জোড়া ছবি।
এগোবই গড়ে গড়ে দেশ আমাদের
সুখ সুখ মন জুড়ে আনন্দ ঢের
মুক্তির আশাতেই যুদ্ধটা হলো
বাংলার জয়ধ্বনি মুখে মুখে বলো।

লাল-সবুজের নুর

এস এম তিতুমীর

বায়না আমার লাল ঘোড়া চাই,
তুমি বললে দেবে।
কিন্তু হবে মেধা যাচাই, পরীক্ষা তাই নেবে !

‘বিজয় সারথি কারা, বলো তো কোথায় তারা ?’
‘যশোরের কাশিপুর কার সমাধি স্থল?
সোনা মসজিদ কার ? রাঙামাটি, আখাউড়ার দরুইন,
রূপসার ফেরিঘাট, কার কার নুরে
মিরপুর হয়ে থাকে দিন ?’

বললাম , ‘আমরা তো ঋণী, চিরদিনই। তাঁরা
তো আছেন এ দেশের বুক জুড়ে।
কাশিপুরে নূর মোহাম্মদ শেখ
মতিউর রহমান মীরপুরে।
মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর আছে সোনা মসজিদ জুড়ে,
মুন্সি আব্দুর রউফ রাঙামাটির শহিদমিনারে।
মোস্তফা কামাল আখাউড়ার দরুইনে,
মোহাম্মদ রুহুল আমিন রূপসার লুকপুরে,
খালিশপুরের মোহাম্মদ হামিদুর রহমান
মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরে।
সত্যি, কি বিস্ময় লাগে !
তাদের জীবন কত বড়ো, আমার লাল ঘোড়ার আগে!
পড়ে থাক বায়না, লালঘোড়া চাই না ,
জবা বকুল দাও এনে
তুলে দিব আজ ঐ সমাধিতে বিয়োগের ব্যথা সবটুকু জেনে।
বিজয়ের দিনে তোমরা যে নেই
মন আজ তাই বেদনা বিধুর,
দেখে নিব আজ ত্যাগের মহিমা,
আর ঐ লাল-সবুজের নুর।

সাহস ভরা সূর্য

আমিনুল ইসলাম মামুন

আমরা হলাম যুদ্ধ জয়ী সেনা
আমাদের এই মাটির কণা
রক্ত দিয়ে কেনা

বিজয় নিয়ে ঘরে এলাম
সাহস ভরা সূর্য পেলাম
সকল বাধা ছিন্ন করার
পথ হয়েছে চেনা
অবাক চোখে বিশ্ব বলে–
মাটির যোগ্য সেনা।

মুজিবের গর্জন

রেদওয়ান মাহমুদ

মুজিবের হুংকারে
জেগেছিল দেশটা
হেরেছিল সব বাধা
সব অপচেষ্টা।
মুজিবের আঙুলে
ছিল মহাশক্তি
তাঁর তরে আমাদের
সম্মান-ভক্তি।
আজও কান পেতে শুনি
মুজিবের গর্জন
এসো এ দেশের হয়ে
করি কিছু অর্জন।

স্বাধীন দেশ

খোরশেদ আলম নয়ন

সুনীল আকাশ যখন মনে
স্বপ্ন বয়ে আনে
তখন আমি বুঝতে পারি
স্বাধীনতার মানে।
কিষাণ বউয়ের মুখে যখন
ফোটে মধুর হাসি
রাখাল ছেলে বটের ছায়ায়
বাজায় যখন বাঁশি।
যায় যে তখন ভেঙে আমার
মনের সকল বাঁধ
আমি তখন বুঝতে পারি
স্বাধীনতার স্বাদ।
কলকলিয়ে উঠে যখন
মেঘনা নদীর জল
শাপলা ফোটা ঝিলে ছড়ায়
স্বপ্ন অবিরল।
পাখি যখন ডানা মেলে
ওড়ে আকাশ পানে
মাঝি যখন গানের সুরে
বৈঠা হাতে টানে
তখন আমি পাই যে খুঁজে
স্বাধীনতার সুখ
স্বাধীন দেশে জন্মেছি তাই
গর্বে নাচে বুক।

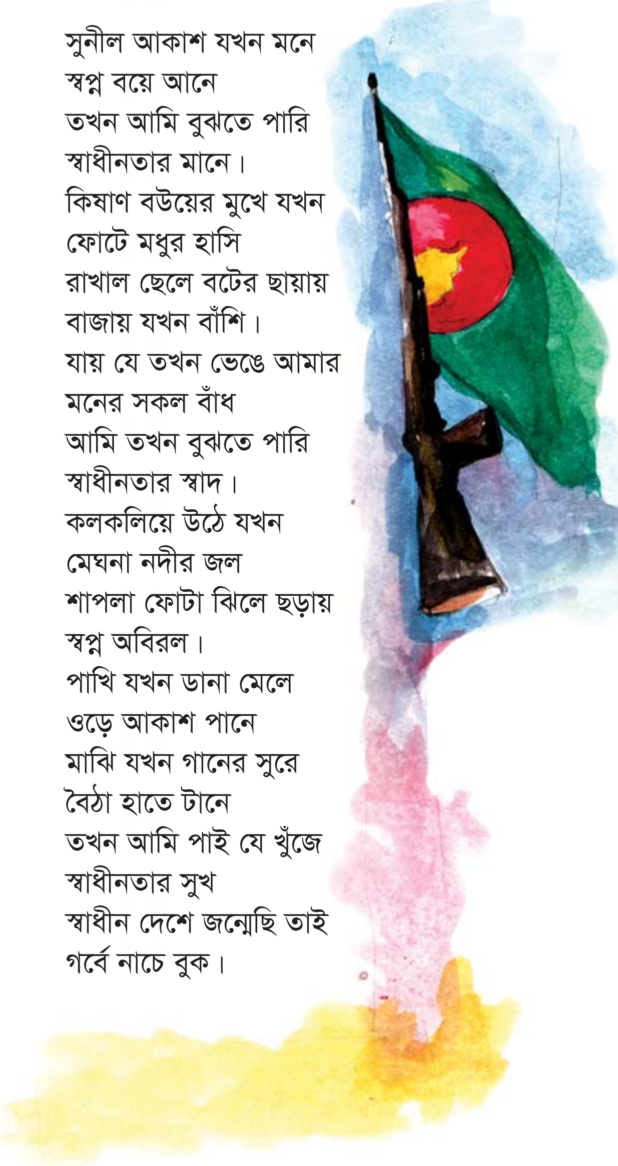

একাত্তরের বিজয় থেকে

আবেদীন জনী

একাত্তরের বিজয় থেকে সাহস নিলাম বুকের মাঝে
রোজ ছড়াব সৃজন আলো চলার পথে কথায়-কাজে।
আমরা হলাম মুজিব সেনা, হার না মানা বীরের জাতি
আজ আমাদের নিয়েই হবে বিশ্বজুড়ে মাতামাতি।

পাহাড় সমান ঢেউ ভেঙে নীল সাগর পথে ছুটব ধেয়ে
মেরুর বুকে হিম বরফে হাঁটব জয়ের গানটি গেয়ে।
এই পৃথিবীর শেষ সীমানায় আসব আলোর প্রদীপ জ্বেলে
আমরা হলাম লাল-সবুজের দীপ্ত মেয়ে, দীপ্ত ছেলে।

চোখের পাতায় স্বপ্নগুলো জ্বলছে দেখো ঝিকিমিকি
দূর নীলিমায় নতুন গ্রহে পায়ের চিহ্ন আঁকব ঠিকই।
গ্যালাক্সি কী ? ব্ল্যাকহোলগুলোর রহস্য কী– জানতে হবে
মঙ্গলে কি বাস করে জীব ? সে খবরও আনতে হবে।

কল্পকথার গল্প থেকে মনের পাতায় স্বপ্ন এঁকে
নতুন কিছু আবিষ্কারের আনন্দে আয় নাচবি কে কে।
ভয় তাড়িয়ে সামনে যাব, জয় ছাড়া নেই আর তো কথা
দেখবে সবাই একাত্তরের সেই বিজয়ের সার্থকতা।

স্বাধীনতার এই যে আমি

রওশন মতিন

জানালা খুলে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি,
ফুল ফুটেছে বলল ডেকে, ভোরের পাখি,
রং ছড়াল রোদের ঝিলিক, মুক্ত আলো
যতই দেখি, অবাক চোখে লাগছে ভালো।

আজ সকালের সূর্যটা কি রক্ত লাল,
বইছে হাওয়া স্বাধীনতার উড়িয়ে পাল ,
ডানপিটে সব ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে উড়তে চায়,
স্বাধীনতার সবুজ দেশে মন যে আমার হারিয়ে যায়।

স্বাধীনতার লাল সূর্য দিগ-দিগন্তে উঠল ফুটে,
স্বাধীনতার খোলা বুকে এই যে আমি চলছি ছুটে!

লাল-সবুজের খাম

অঞ্জন মেহেদী

রক্ত নদী পেরিয়ে এসে
মিছিল নিয়ে লড়াই
আমরা বাঙালি বীরের জাতি
করতে পারি বড়াই।
মহান বিজয় কিনতে গিয়ে
বুক দিয়েছি পেতে,
বাংলাদেশের মাটির মায়ায়
স্বাদ কি সাধে মেটে ?
আরো যারা লড়তে জানি
লক্ষ প্রাণের দামে,
পেয়েছি এক সোনার খনি
লাল-সবুজের খামে।

মানসপটে আঁকা

সাঈদ তপু

মানসপটে একটি আঁকা ছবি
সেই ছবিটা আমরা সবাই চিনি
কাব্য ছড়া না লিখেও যিনি
হলেন দেশের মস্ত বড়ো কবি।
কেউ বা তাকে বলেন চিত্রকর
আঁকাজোকা ছিল না তার পেশা
রাজনীতিটা শুধুই ছিল নেশা
একটি ছবি আঁকেন জীবনভর।
সেই ছবিটা রং তুলিতে নয়
মমতা আর ভালোবাসায় আঁকা
চির সবুজ বেষ্টনীতে ঢাকা
ছবিটা তার ভীষণ আবেগময়।
এই ছবিটার নাম বাংলাদেশ
এই ছবিটা শেখ মুজিবের আঁকা
এই কবিতা শেখ মুজিবের লেখা
এর ভেতরে আমরা আছি বেশ।

ভালোবাসি দেশ

ফাতেমা জান্নাত

রোজ ভোরে পাখিদের
গান শুনে উঠি
ফ্রেশ হয়ে ঠিকঠাক
ইশকুলে ছুটি।

মেঠো পথ দেই পাড়ি
দেখি শুধু চেয়ে
ভালো লাগে অপরূপ
দেশটাকে পেয়ে।

দেশ নিয়ে গর্বিত
হই আমি বেশ
ভালোবাসি মা, মাটি
ভালোবাসি দেশ।

তৃতীয় শ্রেণি, আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট।

শিশু-কিশোররাই

বাতেন বাহার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
বলেছিলেন ভাই
সোনার এ দেশ গড়তে মায়ের
সোনার মানুষ চাই।
সোনার মানুষ কে বা কারা?
স্বাধীন এ দেশ গড়বে যারা,
শক্তি-সাহস-বুদ্ধি দিয়ে
রাখবে অবদান
তারাই মায়ের সোনার মানুষ,
বাংলাদেশের প্রাণ।
মন মননে স্বচ্ছ সাদা
চলার পথে তুচ্ছ বাধা,
গড়ে উঠার গড়ে তোলার
স্বপ্নে বিভোর তাই
সোনার দেশের আসল সোনা
শিশু-কিশোররাই।
সত্যি শিশু উঠলে গড়ে
হবে অমর চরাচরে.
জীবন বোধের সত্য সুরে
থাকবে প্রীতির রেশ
স্বাধীনতায় হাসবে মানুষ,
হাসবে সোনার দেশ।

কী ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে

মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি

আবুল কালাম আজাদ

চমৎকার একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। এই মঞ্চেই বসবে আমাদের ডিসেম্বর মাসের মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলার আসর। এ বছরের জন্য আপাতত এটাই শেষ আসর।

তবে গল্প বলায় আছে ব্যতিক্রম। মঞ্চে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে হবে। মঞ্চের সামনে সারি সারি চেয়ার পাতা আছে। সেখানে বসে বড়োরা শুনবেন আমাদের কথা।

প্রতি বিজয় দিবসেই কলতান ক্লাব মাঠে বিজয়ের অনুষ্ঠান হয়। তবে এবারের অনুষ্ঠান নিয়ে এলাকার মানুষদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা অধিক। কারণ, এবারের অনুষ্ঠানের পারফর্মার সবাই শিশু-কিশোর।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা বিকাল সাড়ে চারটায়। আড়াইটার পরই দর্শক আসা শুরু হয়ে গেল। সাড়ে তিনটার মধ্যে চেয়ারগুলো পূর্ণ।

চারটায় মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াল দুইজন উপস্থাপক শিলা আপা আর সৌরভ ভাই। জাতীয় সংগীত বেজে উঠল। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

আরো কয়েকটা গানের পর এল উপস্থিত বক্তৃতা পর্ব। বক্তৃতার বিষয় : ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস।

শিলা আপা প্রথম বক্তা হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করল। কিছু যে বলতে হবে তা তো জানাই ছিল। ডিসেম্বর মাসের তারিখ দিয়ে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা আমি পকেটে টুকে এনেছিলাম। মঞ্চে গিয়ে সেটা বের করলাম। ডেস্কের উপর নামালাম। তারপর বলতে শুরু করলাম–

আজকের মহান বিজয় দিবসের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের জন্য রইল আমার সম্মান ও ভালোবাসা। সবাইকে বিজয়ের রক্তিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সেই সাথে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক, আমাদের জাতির পিতা, বাংলাদেশের স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের।

আজ এখানে আমি কিছু বলার সুযোগ পেয়ে গর্ব বোধ করছি। আমি আমাদের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় লগ্নের কিছু ঘটনা তুলে ধরব আপনাদের সামনে। ডিসেম্বরের ১ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টের উচ্চ পরিষদে বক্তৃতা করেন। সেখানে উপমহাদেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি সৈন্য অপসারণই সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন।

ডিসেম্বরের ৩ তারিখ। পাকিস্তানি বাহিনী আকস্মিকভাবে স্থল ও আকাশপথে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণ করে। ফলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ভারত ও বাংলাদেশের বাহিনী সম্মিলিতভাবে পূর্ব সীমান্তে অভিযান শুরু করে। ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের পাকিস্তানি অবস্থানগুলোকে ঘিরে ফেলার প্রচেষ্টায় সীমান্তের সাতটি এলাকা দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা সফরে ছিলেন। তিনি ব্রিগেড প্যারেড ময়দানের সভা সংক্ষেপ করে দিল্লি রওয়ানা হন। রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন, পাকিস্তান আজ ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছে। পাকিস্তানের আক্রমণ ঐক্যবদ্ধভাবেই প্রতিহত করতে হবে।

লড়াইয়ের তৃতীয় দিন অর্থাৎ ৫ই ডিসেম্বর। এ দিনই স্বাধীন বাংলার আকাশ শত্রুমুক্ত হয়। বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর প্রায় সব বিমান ধ্বংস হয়ে যায়। সারাদিন ভারতীয় বিমানগুলো অবাধে আকাশে উড়ে। লোকজন বাড়ির ছাদে উঠে আনন্দের সাথে দেখেছে সেই সব বিমান। নৌবাহিনীর যৌথ কমান্ড চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজগুলোকে বন্দর ত্যাগের পরামর্শ দেয়। বিশ্বের সব দেশ বুঝতে পারে, বাংলাদেশের বন্দরগুলো রক্ষা করার ক্ষমতা পাকিস্তানি বাহিনীর নেই।

৬ তারিখ হলো সেই সোনালি দিন। সেদিন বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বৃহৎ একটি দেশ স্বীকৃতি দেয়। সে দেশটি হলো ভারত। আর এ দিনই নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বিরতি সংক্রান্ত মার্কিন প্রস্তাবের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় দফা ভেটো দেয়।

আর ৭ তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ভুটান। ঐ দিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ভারতীয় নবম ডিভিশনের প্রথম কলামটি উত্তর দিক দিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্টের কাছে এসে পৌঁছায়। কোনো প্রতিরোধ নেই। যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে সব পাকিস্তানি সৈন্য পালিয়েছে। পালানোর সময় তারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও রেশন ফেলে যায়।

ডিসেম্বরের ৮ তারিখ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন।

পাকিস্তানি কুচক্রিরা বুঝে গিয়েছিল যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আটকে রাখা সম্ভব নয়। তখন তারা আরেকটি নির্মম চাল চালে। তারা আমাদের মেধা ধ্বংস করে দিয়ে যেতে চায়। সেই সূত্র ধরেই তারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে নিয়ে আসে সাহিত্যিক, শিল্পী, ডাক্তার, সাংবাদিক, শিক্ষক এবং আরো বুদ্ধিজীবীদের। ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে তাদেরকে মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের বধ্যভূমিতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। আর এই নিষ্ঠুর কাজটি করে বর্বর আলবদর বাহিনী। তাদের পরিচালনা করে পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলী।

এইসব আলোকিত মানুষদের হত্যা করে ওরা এ জাতিকে শতবর্ষ পিছিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের পথ চলা থামাতে পারে না।

জেনারেল নিয়াজির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ই ডিসেম্বর ভোর ৫টা থেকেই ঢাকার ওপর বিমান হামলা

বন্ধ রাখা হয়। পাশাপাশি যৌথবাহিনীর পক্ষ থেকে জেনারেল নিয়াজিকে জানিয়ে দেওয়া হয়, পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত কোনো যুদ্ধবিরতি হতে পারে না। ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৯টার মধ্যে শর্তহীন আত্মসমর্পণ না করলে আবার বিমান হামলা শুরু করা হবে। বিনা প্রতিরোধে যৌথবাহিনী সাভারে প্রবেশ করে। সাভারে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটে রাজধানীর প্রবেশপথ মিরপুর ব্রিজের ওপর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু রাতেই যৌথবাহিনী কমান্ডো পদ্ধতিতে ব্রিজে আক্রমণ চালায়। সারারাত তুমুল যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটে।

১৬ই ডিসেম্বর। বেলা নয়টায় যৌথবাহিনীর ডিভিশনাল কমান্ডার জেনারেল নাগরার বার্তা নিয়ে নিয়াজির হেডকোয়ার্টারের অভিমুখে সাদা পতাকা উড়িয়ে জিপে করে রওয়ানা হন ভারত ও বাংলাদেশের দুই অফিসার। বার্তায় লেখা ছিল–'*প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি এসে পড়েছি। এখন আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। এ আমার উপদেশ।*'

বিকাল পৌনে পাঁচটায় পরাজিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজি রেসকোর্স ময়দানে আসেন। বিকেল ৫টা ১ মিনিট। নিয়াজি দলিলে স্বাক্ষর করে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিলেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে। বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নিল আরো একটি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে হেসে উঠল বাঙালি জাতি।

আমি মঞ্চ থেকে নেমে এলাম। এরপর ডাক পড়ল আমাদের বন্ধু রিনির। ও বলল, বাংলার বুক থেকে পাকিস্তানের নাম মুছে গেল। জন্ম নিল স্বাধীন বাংলাদেশ। আমাদের স্বাধীনতার মহান নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান জেলে আটক। তাঁকে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত এ স্বাধীনতা মূল্যহীন।

যুদ্ধ শেষে পরাজিত ইয়াহিয়াকে গদি থেকে সরে যেতে হলো। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। ভুট্টো গদিতে বসেই বিভিন্ন দেশের চাপ অনুভব করলেন–শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হোক। শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে হলো।

১৯৭২ সালে ৮ই জানুয়ারি। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো স্বয়ং বিমানবন্দরে এসে বিদায় দিলেন সিংহ হৃদয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ৯ই জানুয়ারি তিনি লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছালেন। প্রবাসী বাঙালিরা তার সঙ্গে দেখা করতে এলে তাদের মুখে হানাদার বাহিনীর লোমহর্ষক নিষ্ঠুরতার কথা শুনে তিনি শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন।

৯ই জানুয়ারি রাতেই ব্রিটিশ বিমান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লন্ডন থেকে ঢাকার উদ্দেশে উড়াল দিল। ঢাকার বুকে তখন মানুষের ঢল। সকাল থেকেই সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ঘরের ছেলের ঘরে ফিরে আসার প্রতীক্ষায়।

বেলা ১ টা ৪৫ মিনিটে বিমানটি তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করল। বিমান থেকে নেমে এলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। একত্রিশ বার তোপধ্বনি করে গার্ড অব অনার দিয়ে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো। তারপর ২ টা ২০ মিনিটে একটা সুসজ্জিত খোলা ট্রাকে করে বিশাল জনসমুদ্র ঠেলে শেখ মুজিবকে নিয়ে রমনা রেসকোর্স ময়দানের দিকে রওয়ানা দেওয়া হলো। ৪ টা ৪০ মিনিটে তিনি মঞ্চে দাঁড়ালেন। অশ্রুসজল চোখ নিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বাংলার জনগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানালেন। শ্রদ্ধা জানালেন অমর শহিদদের উদ্দেশে।

রিনি কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল, অনেক রক্ত ও মা-বোনের সম্মানের বিনিময়ে কেনা আমাদের এই স্বাধীনতা। আমরা ছোটো-বড়ো সবাই এ দেশের, এই স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী।

আসলেই তো! আমরাই তো এই অপরূপ বাংলা মায়ের কাদামাটির সন্তান। এই দেশকে ভালোবেসে রক্ষা করে যাব আমরাই। ২০৪১ সাল নাগাদ প্রিয় বাংলাদেশ সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে তো আমাদের হাত দিয়েই। মহান মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহিদ আর বীর মুক্তিযোদ্ধারা দেশের স্বাধীনতা উপহার দিয়ে গেছেন। এবার ঋণ শোধ করার পালা আমাদের।

বড়োদের সবার চোখে আনন্দাশ্রু আর মুখে ভালোবাসার হাসি দেখে বুঝলাম, একটুও ভুল ভাবিনি আমি, আমরা। ■

মুক্তিযুদ্ধের সত্য ঘটনা অবলম্বনে

‘পাঞ্জাবি মারুম’

মিয়াজান কবীর

মানিকগঞ্জের পারিলের একটি গ্রাম নওয়াধা। পারিল-নওয়াধা নামে সুপরিচিত এই গ্রামের খান বাহাদুর নজিব উদ্দিন আহমেদ ছিলেন একজন নামজাদা লোক। ব্রিটিশ সরকারের প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলিম দাঙায় শত শত লোকের প্রাণহানি ঘটে। এই ঘটনায় তিনি মর্মাহত হন। তিনি রক্তপাতের ঘটনায় প্রতিবাদী হয়ে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া খানবাহাদুর খেতাব বর্জন করেন।

ব্রিটিশ সরকারের খেতাব বর্জন করলেও লোকে তাঁকে খানবাহাদুরই বলত। খানবাহাদুর নজিব উদ্দিন আহমেদ সাহেবের ছেলে নাইব উদ্দিন আহমেদ একজন প্রখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী। রূপসি বাংলার ধলেশ্বরীর বুকে পালতোলা নাও, গুণটানা মাঝি, কলসি কাঁখে পল্লিবালা এসব ছবি তুলে তিনি প্রশংসিত হন। সেই সুবাদে একজন আলোকচিত্রী হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি লাভ করেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে থাকেন। প্রত্যন্তঞ্চলে ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি তোলেন। ছবিগুলো গোপনে বিদেশি পত্রপত্রিকায় পাঠিয়ে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন।

নাইব উদ্দিন আহমেদ বাসায় ফিরে এসে পরিবার পরিজনের সঙ্গে গল্পকথায় ডুবে যেতেন। মাঝে মাঝে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ উঠে আসত। বাঙালি আর পাঞ্জাবিদের মধ্যে বৈষম্য নীতির ফলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সেইসব ক্ষোভের দরুন শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালিরা অস্ত্র হাতে বাংলার পথে-ঘাটে লড়াই করছে। তাঁর সাত বছরের ছোট্ট ছেলে নিপুন আগ্রহ ভরে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের কথা শুনে ছোট্ট ছেলেটি উৎফুল্ল হয়ে উঠে।

নিপুন তার খেলার সাথিদের নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মেতে উঠে। ‘হ্যান্ডস আপ’ বলতেই পাঞ্জাবি রূপী খেলার সাথিরা হাত উঁচু করে আত্মসমর্পণ করে। বিজয়ের গর্বে নিপুনের বুক স্ফিত হয়ে উঠে।

পাকিস্তানি বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন কাইয়ুম। বয়সে তরুণ-সৌখিনতায় মন তার ভরপুর। এই সবুজ-শ্যামল বাংলার প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য দেখে তার মন আকুল হয়ে উঠে। বাংলার অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলতে তার সাধ জাগে। তার একটি ক্যামেরা ছিল। সেই ক্যামেরা দিয়ে বাংলার প্রাকৃতিক রূপ সৌন্দর্যের ছবি তুলতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন ক্যামেরাটিতে ত্রুটি দেখা দেয়। এতে ক্যামেরায় ছবি প্রতিবিম্বিত না হওয়ার দরুন ক্যাপ্টেন কাইয়ুম নাইব উদ্দিন আহমেদের শরণাপন্ন হন। মুক্তাগাছা চেকপোস্টে কোনো একদিন বাসযাত্রীদের তল্লাশি করার সময় পরিচয়পত্র দেখে বুঝতে পারেন নাইব উদ্দিন আহমেদ একজন আলোকচিত্রী। সেই সুবাদে নাইব উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের পরিচয় হয়েছিল। সেই পরিচয় সূত্রে ৪ঠা সেপ্টেম্বর

ক্যাপ্টেন কাইয়ুম ক্যামেরাটি নিয়ে হাজির হন নাইব উদ্দিন আহমেদের বাসায়।

খাকি ইউনিফরম পরিহিত ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে দেখে কৌতূহলী হয়ে নিপুন উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। কথার ফাঁকে এক সময় ক্যাপ্টেনের চোখ নিপুনের দিকে পড়ে। শ্যামবর্ণের ছেলেটির বুদ্ধিদীপ্ত চোখের চাহনি ক্যাপ্টেনকে আকৃষ্ট করে। ক্যাপ্টেন নিপুনকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকেন।

ইশারা বুঝতে পেরে নিপুন ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়ায়। ক্যাপ্টেন নিপুনের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কী?

নিপুন জবাব দেয়, আমার নাম নিপুন।

নিপুন ক্যাপ্টেনের কোমরের পিস্তলটি হাতড়াতে থাকে। পিস্তলের প্রতি আগ্রহ দেখে নিপুনকে ক্যাপ্টেন বললেন, তুমি পিস্তল নিবে?

নিপুন বলল, হ্যাঁ।

ক্যাপ্টেন ছোট্ট ছেলেটির কৌতূহলী কথা শুনে বললেন, তুমি পিস্তল দিয়ে কী করবে?

নিপুন এবার বুক ফুলিয়ে বীরের মতো বলল, পিস্তল দিয়ে আমি 'পাঞ্জাবি মারুম'।

ক্যাপ্টেন কাইয়ুম ছোট্ট ছেলে নিপুনের এমন কথা শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে রাগান্বিত স্বরে বললেন: 'বাঙালি সব গাদ্দার হ্যায়।'

নাইব উদ্দিন আহমেদ ছেলের এমন অপ্রত্যাশিত কথায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। যেন একেবারে থ' বনে গেলেন। ক্যাপ্টেনের অগ্নিশর্মা রূপ দেখে তিনি চিন্তাগ্রস্ত হলেও একেবারে মুষড়ে পড়লেন না।

পাঞ্জাবি মারুম এ তো তার নিজেরও অন্তরের কথা। তবে হানাদার বাহিনীর ক্যাপ্টেনকে কি প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন হলেন। বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ও একেবারে মাছুম বাচ্চা। ওর কথায় কিছু মনে করবেন না।

ক্যাপ্টেন আর কোনো কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়ান। কপাল কুঁচকে বুট পায়ে ঠক ঠক করে গাড়ির দিকে এগিয়ে যান।

ক্যাপ্টেন কাইয়ুম ছিলেন জাতিগতভাবে বেলুচি। বেলুচিরা পাকিস্তানি হলেও পাঞ্জাবিদের মতো এতটা বদরাগি নয়। তাছাড়া পাঞ্জাবিদের সঙ্গে বেলুচিদেরও মধ্যে নানা বিষয়ে বৈষম্য চরমে পৌঁছেছে।

তাছাড়া ক্যাপ্টেন কাইয়ুম কিছুটা ভদ্র প্রকৃতির ছিল। তিনি বুঝতে পারেন যে, ছোট্ট ছেলেটির কথায় তার এমন আচরণ করা ঠিক হয়নি। গাড়ির কাছাকাছি গিয়ে কি যেন মনে করে আবার ফিরে আসেন। ক্যাপ্টেনকে ফিরে আসতে দেখে নাইব উদ্দিন আহমেদের উদ্বিগ্নতা আরো বেড়ে যায়। ক্যাপ্টেন একসময় দরজার সামনে এসে দাঁড়ান। এরপর ক্যাপ্টেন তার অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে দ্রুত পায়ে হেঁটে গাড়িতে উঠে যান।

নাইব উদ্দিন আহমেদ নির্বাক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। নিজ পরিবারের জীবন বিপন্নতার কথা ভেবে তার গলা শুকিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন চলে যাবার পর বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন ভেবে স্বস্তি ফিরে পান।

নিপুন একজন খুদে মুক্তিযোদ্ধা। হানাদার ক্যাপ্টেনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার দুঃসাহসী উচ্চারণ 'পাঞ্জাবি মারুম।' এ শব্দটি যেন বজ্রকণ্ঠ হয়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সেদিন বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেনের গর্বকে খর্ব করে দিয়েছিল নিপুন।

খুদে মুক্তিযোদ্ধা নিপুনের দুঃসাহসিকতা স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। খবরটি শুনে হানাদার বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়ে। বিশ্ব জুড়ে সাড়া জাগে। ■

[নিপুনের প্রকৃত নাম নওশের আহমেদ। বাবা-নাইব উদ্দিন আহমেদ, মা-আমিনা আহমেদ। জন্ম: ৮ই অক্টোবর ১৯৬৪ মৃত্যু: ১৯শে নভেম্বর ২০১৪। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের উপপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শিশু নিপুনকে নিয়ে মিয়াজান কবীর রচনা করেছেন 'একাত্তরের সেই ছেলেটি'।]

বিজয়ের উল্লাসে

তাজিয়া কবীর

হঠাৎ ঢোলের শব্দ শোনা যাচ্ছে সবাই কান খাড়া করে শুনল শব্দটা হিন্দু পাড়া থেকে আসছে। আমার মেজ কাকা রেডিও খুলে শুনতে পেলেন বিশেষ খবর প্রচারিত হচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলার বীর সন্তানেরা ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাক হানাদার বাহিনীর কাছ থেকে বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে এনেছে। মেজ কাকা এ খবর বলার সাথে সাথে বাড়ির সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

আমাদের বাড়ি ভর্তি তখন অনেক মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে শহরের আত্মীয়স্বজনরা এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের বাড়িতেও তেমনটি ছিল।

এ ছাড়া আমাদের বাড়িতে আরো কয়েকটা পরিবার ছিল তারা আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দু পরিবার। হিন্দুদের দেখলেই পাক হানাদার বাহিনী গুলি করে মেরে ফেলত। তার চেয়েও বড়ো ভয় ছিল রাজাকার আলবদর বাহিনী নিজেরা সাথে থেকে তরুণ ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে হানাদার পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দিত।

আমার মেজ কাকা গ্রামের মাতব্বর ছিলেন। তিনি কয়েকটা হিন্দু পরিবারকে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সারারাত জেগে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল রাতে, যাতে তাদের কোনো অসুবিধা না হয়। তাদের সোনা-গয়না, টাকা-পয়সাসহ দামি দামি জিনিসপত্র মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর তাদের জিনিসপত্র তাদের হাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বিপদের দিনে যারা এমন উপকার করে তাদের কি কখনো ভোলা যায়? তাই তো দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দের দিনে হিন্দুপাড়া থেকে মুরুব্বিরা আমাদের বাড়িতে এসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা ছিলাম কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায়। পাকশির হার্ডিংঞ্জ

ব্রিজ পার হয়ে যখন পাকিস্তানি আর্মি ভেড়ামারায় প্রবেশ করে তখন ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ বাহিনী) ব্রিজের উপর পাহারায় ছিল। পাক বাহিনীর অস্ত্রের মুখে টিকতে না পেরে ইপিআর ওখান থেকে চলে আসে। বাঙালি সৈন্যরা যাবার সময় দু'হাত তুলে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমরা আর পারলাম না। আপনারা যার যার জীবন নিয়ে পালান।

ঐ কথা শুনে আমরা বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি। সাথে আর একটা পরিবার আমাদেরই পাশের বাসার। ওখান থেকে আমরা পাঁচ মাইল দূরে এক গ্রামের আম বাগানে গিয়ে আশ্রয় নেই। গ্রামের নাম মওহেশপুর।

যাবার সময় দেখতে পাই হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেঁটে চলেছে। সবারই গন্তব্যস্থল একটাই দূরে কোথাও নিরাপদ আশ্রয় নেওয়া। আমরা যে পথ দিয়ে হাঁটছি তার পাশের গ্রাম আগুনে পুড়ে যাচ্ছে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। গ্রামের পর গ্রাম ওরা জ্বালিয়ে শেষ করে দিচ্ছে আর তাদের দেশের হয়ে এই বাংলার রাজাকারের দল লুটতরাজ করে নিচ্ছে সব কিছু।

এত বছর পরে বিজয়ের দিনে আমার বার বার সেই মহামানবের কথাই মনে পড়ছে, যার ভাষণ শুনে বাংলার কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র সবাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আরো অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যায় এই মুহূর্তে। আমরা বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ার পরদিন আব্বা গোপন রাস্তা দিয়ে বাসায় এসে দেখেন, আমাদের বাসা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সব কিছু ছাই হয়ে গিয়েছে। আর রাজা কাকার বাসা লুট হয়ে গিয়েছে। রাজা কাকা ছিলেন আমাদের সাথে। আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গেল। আমার বইগুলো পুড়ে গিয়েছে, তাই খুব রাগ হচ্ছিল।

এই আনন্দের দিনে বার বার মনে পড়ছে, পথে দেখা হওয়া দুই মুক্তিযোদ্ধার কথা। জানি না সেই মুক্তিযোদ্ধা দু'জন বেঁচে আছেন নাকি দেশের জন্য শহিদ হয়েছেন। এমনিভাবে কত মা তাঁর সন্তান হারিয়েছেন, কত বোন তার ভাইকে হারিয়েছেন, কত স্ত্রী হারিয়েছেন তার স্বামীকে।

অনেক কিছু হারানোর পর, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমরা এনেছি এই স্বাধীনতা। অনেক ত্যাগের কথা বলতে মনে পড়ে যায় এক মায়ের ত্যাগের কথা। তিন ছেলেকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে যায়। অনেক নির্যাতন করে। মা ছেলেকে দেখতে যায়। ছেলে মাকে বলে, মা দুদিন ধরে ভাত খাই না। আমার জন্য ভাত রান্না করে নিয়ে এসো।

মা ছেলের জন্য ভাত রান্না করে টিফিন ক্যারিয়ারে করে নিয়ে যায়। গিয়ে ছেলেকে পায় না। মা ভাত নিয়ে ছেলেকে পাগলের মতো খুঁজতে থাকে। সেদিন থেকে মা আর ভাত মুখে তুলেননি। তারপর তিনি চৌদ্দটি বছর বেঁচে ছিলেন ভাত না খেয়ে। তিনি হলেন শহিদ আযাদের জনম দুখিনী মা।

এদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। তাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ গর্বিত স্বাধীন বাঙালি জাতি। ■

চিরকালের বন্ধু

দেলোয়ার হোসেন

ঐ-যে দূরে আকাশ কাঁদে
বুকের ভিতর বাতাস কাঁদে
সকাল দুপুর দোয়েল কাঁদে
ময়না, শালিক, কোয়েল কাঁদে
কোকিল কাঁদে কুহু-কুহু স্বরে-
বন্ধু তুমি সবার ছেড়ে
ঘুমাও মাটির ঘরে।

ফুল-পাখিরা কাঁদে বনে
তোমার কথা পড়ে মনে
শাপলা কাঁদে বিলের জলে
তোমার কথা সবাই বলে
তুমি ছিলে সবার সুখে-দুখে,
থাকবে জানি অনন্তকাল
সবার মুখে-মুখে।

বুকের তাজা রক্ত ঢেলে
বন্ধু তুমি হারিয়ে গেলে,
ইতিহাসের পাতায়-পাতায়
বাঙালিদের বুকের খাতায়
তুমি আছো প্রতি ঘরে-ঘরে,
চিরকালের বন্ধু তুমি
ভুলবো কেমন করে।

তোমাদের লেখা মুক্তিযুদ্ধের গল্প

মুক্তিযোদ্ধার দিনলিপি

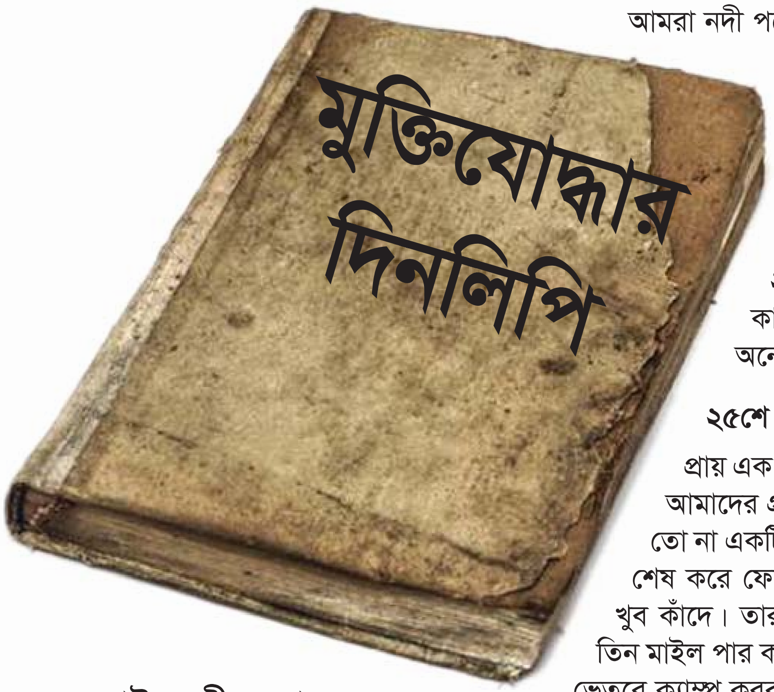

রেজাউন নবী রেজান

৬ই মার্চ, ১৯৭১

আমি ক্লাস এইটে পড়ি। আজকে বিজ্ঞান স্যার আসবেন তিনি গতকাল বেশি পড়া দিয়েছিলেন। তিনি খুব রাগি। পড়া না পারলে বেতের বাড়ি খেতে হবে। বিজ্ঞান স্যার এসে বললেন আজ থেকে তোমাদের স্কুল বন্ধ।

সে দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ৬ই মার্চ। আমি রিয়াদ ও ফাহিম বাড়ি যাচ্ছিলাম। আমাদের ভেতরে সবচেয়ে সাহসী হলো ফাহিম। রিয়াদ একটু ভীতু প্রকৃতির। আর আমি বই পড়ুয়া। আমাদের গ্রামে রাজাকাররা ঢুকে পড়ল। সবাই আতঙ্কিত। সবাই দরজা জানালা বন্ধ করে বসে আছে।

৭ই মার্চ

আজ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। বাঙালিরা সেই ভাষণ শুনে এগোতে থাকে। তাঁরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফাহিমের কাছে একটি চিঠি পেলাম। তাতে লেখা ঠিক এরকম, আমরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিচ্ছি। তুমি আসো।

আমি তখন ফাহিমের বাড়ি যাই। সে বলল, কালকে আমরা নদী পথে ভারতে যাব। আমি তোমাকে একটি গ্রেনেড দিচ্ছি। আমি যখন বলব তখন ছুঁড়ে মারবে।

রিয়াদ বলল, আমিও যোগ দেব মুক্তিযুদ্ধে। ফাহিম বলল, ঠিক আছে।

২৩শে এপ্রিল

কাল আমরা ভারতে গেলাম। অনেক ট্রেনিং হলো।

২৫শে মে

প্রায় এক মাস পর নিজের দেশে আসলাম। আমাদের গ্রামের সে কি অবস্থা। যেন গ্রাম তো না একটি নরক। সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে ফেলেছে। আমাদের তিনজনের মন খুব কাঁদে। তারপর হাঁটা শুরু করলাম আমরা। তিন মাইল পার করেছি। আজকে এই ঘন জঙ্গলের ভেতরে ক্যাম্প করব।

উত্তর-পশ্চিম দিকে হাঁটছি আমরা। ঘন ঘাসের ভেতরে দেখা যায় একটি ক্যাম্প। মিলিটারিরা পাহারা দিচ্ছে। সাথে সাথে ফাহিম পিস্তল দিয়ে দুইজন মিলিটারিকে শেষ করে দিলো। আমরা ঘাসের ভেতর দিয়ে ক্রসিং করে আসছিলাম। ফাহিম আমাকে বলল, ছোঁড় গ্রেনেডটা।

আমি তিক করে ছুঁড়লাম আর সাথে সাথে বোমার আঘাতে ১০ জন উড়ে যায়। বাকি রইল মাত্র একজন। সে এই দলের নেতা। নাম তার সিকসান। তাকে আমরা বেঁধে ক্যাম্পে শুইয়ে দিলাম। আমরা ক্যাম্প থেকে অনেক অস্ত্রপাতি নিলাম। সৌভাগ্য আমরা ক্যাম্পে একটি রেডিও নিয়েছিলাম।

২৯শে মে

কাল আমরা গেলাম একটি গ্রামে। গ্রামের নাম বদ্ধভূমি। সেখানে এক বাড়িতে এক বেলা থাকলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম আবার উত্তর দিকে। তখন দুপুর বেলা। আমরা দুরবিন দিয়ে দেখলাম যে এক কিলোমিটার পর আরেকটা মিলিটারি ক্যাম্প আছে।

বিজয় ফুল

সেখানে ২০-৩০ জন মানুষ। তিনজন সিপাই পাহারা দিচ্ছে। আমরা ঘাসের ভেতর ক্রসিং করতে করতে এগোলাম। ঠিক তখনই ফাহিমের পায়ে একজন গুলি করে। আমি রিয়াদ দুজন পিস্তল দিয়ে গুলি চালাচ্ছিলাম। সে কি তুমুল যুদ্ধ। নিরাপদ জায়গায় এসে ফাহিমকে নিয়ে ওষুধপত্র লাগালাম।

৩রা জুন

পাকিস্তানিরা সবাইকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা লুকিয়ে ছিলাম বলে বেঁচে গেলাম। আমরা তাদের পিছু নিই কিন্তু ব্যর্থ হই। কারণ গাড়ির তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল। তেল ভরতে একঘন্টা সময় লাগল। তাই আমরা ব্যর্থ হলাম।

ক্যাম্পে ঢুকলাম। দেখি ফাহিম চারটা গোলাবারুদ প্রস্তুত করছে। গাড়ি নিয়ে ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিলাম। ১০ টার দিকে রওনা দিলাম।

৭ই জুলাই

কাল খুব পরিশ্রম হয়েছে।

সকাল ৭টা বাজে। এখন আমরা যাচ্ছি পশ্চিম দিকে। সকাল ১০টা বাজে। আমরা একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। মনে হচ্ছিল পরিত্যাক্ত। ফাহিম গিয়ে দেখল কেউ নেই। অনেক খাবার ও পানি আছে। সব গুছিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

কেমন টিক টিক শব্দ হচ্ছিল। ফাহিম গাড়ির পিছনে দেখল। দেখল যে একটা টাইম বোম। ফাহিম বোমটা নিষ্ক্রিয় করল। আমরা এ বোমটা নিলাম। ফাহিম বলল, এটা একটা চাল। কিন্তু আমরা বেঁচে গেছি।

১২ই আগস্ট

ভাগ্যিস পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে সবাই ঘুমাচ্ছিল। আমরা ওদেরকে হারিয়ে দিলাম।

১৯শে অক্টোবর

অক্টোবর মাস। হালকা শীত পড়েছে। ঘন কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তিনটা কেটা নিলাম। কেটা অর্থ খবরের কাগজ। মুক্তি যোদ্ধারা আগে তাই বলত। ফাহিম রেডিও চালু করল। কিছুক্ষণ পর আর সিগন্যাল পাই না। আমি বললাম, পাকিস্তানিরা রেডিও বন্ধ করল।

৯ই নভেম্বর

সকাল ১২টা। কুয়াশা আর নেই দেখি খাবার পানি শেষ। দ্রুত একটা ক্যাম্প খুঁজতে হবে। ফাহিম বলল, না। কেন ? কারণ আমরা ভুল দিকে যাচ্ছি। আমাদের কে যেতে হবে দক্ষিণ দিকে। কারণ সেখানে ১০ টা মিলিটারি ক্যাম্প আছে।

১১ই নভেম্বর

আমরা পাবনায় পৌছালাম। এখানে একটা রাজাকার ক্যাম্প আছে। আমরা সেই ক্যাম্পে পৌছালাম। রিয়াদ একসাথে চারটা গ্রেনেড ছুঁড়েছে। পুরা ক্যাম্প আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে গেল। আমরা কোনো ভাবে ভিতরে ঢুকলাম। খাবার আর পানি নিলাম। আর একটা বন্দুক আছে। তিনটা গুলির প্যাকেট নিলাম।

১৫ই নভেম্বর

এবার পৌছালাম ঝিনাইদহে। আজ আমরা এখানে ক্যাম্প করে থাকব।

১৭ই নভেম্বর

ভোর ৬টা। খুবই ঘন কুয়াশা। আবার বেরোলাম। সকাল ৮টা বাজে।

পৌছে গেলাম ডাক বাংলায়। পাকিস্তানি নির্যাতন ক্যাম্প। খুব বড়ো। ৩ বিঘা জমি নিয়ে গঠিত এ নির্যাতন ক্যাম্প।

আমরা খুব বাঁচা বেঁচে গেছি। রিয়াদ বলল, আমরা ভোলা যাব। ফাহিম বলল, ঠিক আছে।

২০শে নভেম্বর

ভোলা ব্রিজ পারে খুব সময় লেগেছিল। সকাল ৯টা। খুব কষ্টে ব্রিজ পার করলাম আমরা।

ক্যাম্প নম্বর-২। ১০০ জন সৈন্য। খুব বেশি মানুষ না। আমিও ফাহিম একসাথে ১০০ গ্রেনেড ছুঁড়লাম। সবাই মরে গেল গ্রেনেডের হামলায়।

২১শে নভেম্বর

সারারাত পরিশ্রমের পর কক্সবাজার পৌছালাম। এখানে সবচেয়ে ছোটো ক্যাম্পটা আছে। দলে মাত্র ৪জন। আমি রাইফেলের গুলি ছুঁড়তেই তারা শেষ।

২৪শে নভেম্বর

এবার পৌছালাম নোয়াখালিতে। দুপুর ৩টা। খুব রোদ, দুপুরের খাবার শুরু করলাম।

২৭শে নভেম্বর

আমাকে ওরা ধরে ফেলেছিল। ওরা আমাকে আটকে রাখে। কষ্ট দেয়। কিছু খেতে দেয়না। শুধু কাজ করায়। একটি কাজ করার সময় আমি পালিয়ে ছিলাম। তারা ধরতে পারেনি আমাকে। আমি জানি ফাহিমও রিয়াদ কোথায় আছে। আমি গেলাম ওদের কাছে।

তাদের কাছে গিয়ে দেখি একটি বাচ্চা। বয়স নয় বছর। ওরা অনেক শিখে এসেছে। বাচ্চার নাম সাব্বিন। তাকে আমরা একটা গ্রেনেড দিলাম। ট্যাঙ্ক নিয়ে আবার এগিয়ে গেলাম।

২রা ডিসেম্বর

দুইদিন ধরে হাঁটছি। খুব কষ্ট হচ্ছে সাব্বিনের।

হঠাৎ দেখি রাজাকার ক্যাম্প। যুদ্ধ শুরু করলাম আমরা। ফাহিম জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছে। হঠাৎ তার বুকে একটা গুলি লাগল। আমরা তাকে নিয়ে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি ফাহিম আর বেঁচে নেই। আহা! ফাহিম আমার বন্ধু। ওর কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

৩রা ডিসেম্বর

খুবই ঠান্ডা। সাব্বিন কাঁপছে ঠান্ডার জন্য। আমার খুব আব্বু আম্মুর মুখ দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তারা তো আর নেই। এই কথা শুনে আমার চোখে জল পড়ছে। রিয়াদ আমাকে সান্ত্বনা দেয়। হাঁটা শুরু করলাম।

৪ঠা ডিসেম্বর

সাব্বিনকে হারালাম। ঠান্ডার কষ্ট ও আর সহ্য করতে পারেনি। ওকে আমরা সমাহিত করলাম। খুব কষ্ট হচ্ছিল।

১৪ই ডিসেম্বর

আমরা ৩টা যুদ্ধ জিতেছি।

১৬ই ডিসেম্বর

রেডিওতে শুনলাম, পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। আমরা খুব খুশি। এই স্বাধীনতা আমাদের অর্জন। মুক্তিযুদ্ধ আমার গর্ব। কোনোদিন ভুলতে পারব না। ■

তৃতীয় শ্রেণি, ঝিনাইদহ কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঝিনাইদহ

মুক্তিসেনা

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

একাত্তরের রক্ত-নদী
আমরা দিয়ে পাড়ি
কেউ পেয়েছে বধ্যভূমি
কেউ ফিরেছে বাড়ি।

পুড়ছে কতো সবুজ গেরাম
টিক্কা খানের সৈন্য,
যুদ্ধদিনে শ্যামল মায়ের
ছিলো দশা দৈন্য।

দিশে হারার দুঃখ দেখে
অস্ত্র নিয়ে হাতে
শেখ মুজিবের মুক্তিসেনা
কেউ ঘুমাইনি রাতে।

জীবন মরণ লড়াই করে
বীর সেনাদের বেশে
লাল সবুজের এই পতাকা
ফিরলো নিয়ে দেশে।

গল্পটা দাদুর

অদ্বৈত মারুত

ঘা একটু জোরেই মারল মনি। পিঠের মাঝখানে। সে পুলিশ অফিসার। আসামি ধরতে এসে খুঁজে পায়নি। পেয়েছে আরেকজনকে। একই পরিবারের। তাই লাঠি দিয়ে ঘা। লাঠি নয়, মনির কাছে এটা বন্দুক। চোর ধরতে গিয়ে তো পুলিশ বন্দুকই কাছে রাখে।

আফরোজা বেগম নামাজ পড়ছিলেন। জোহরের। সালাম ফেরাননি। এমন সময়ই ঘা। নবিতা আর মনি চোর-পুলিশ খেলছিল। সারাদিন ওরা কতরকম খেলা খেলে। ইচিং বিচিং, এক্কাদোক্কা, ওপেন টু বায়োস্কোপ, বউচি, কানামাছি, কুতকুত, ষোলো ঘুঁটি, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্ধা। এসব খেলায় দিদাও অংশ নেন। আজ তিনি একটু আগেভাগে নামাজ পড়তে বসেছিলেন। দিদা যে খেলছেন না, মনি তা বুঝতে পারেনি। তাই খেলতে খেলতে পিঠে ঘা দিল।

নামাজ শেষ করে আফরোজা বেগম আনমনা হয়ে বসে রইলেন। একদম চুপচাপ। মনে পড়ে গেল তার উনিশশ একাত্তর সালের কথা। জোহরের নামাজ সেদিন তিনি এভাবেই শেষ করেছিলেন।

দিদা কথা না বলায় মনি, নবিতা ভয় পেয়ে গেল। ওরা দিদাকে ডাকল। ভুল স্বীকার করে বলল– ও দিদা, কথা বলো। স্যরি। আর কখনো তোমাকে মারব না। স্যরি, স্যরি, স্যরি...

আফরোজা বেগম বুঝলেন, ওরা খুব কষ্ট পাচ্ছে। মুচকি হাসি দিয়ে দুজনকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন– চলো, খেয়ে নিই। তারপর শুয়ে শুয়ে তোমাদের গল্প শোনাব। তোমাদের দাদুর গল্প, মুক্তিযুদ্ধের গল্প।

দত্তবাড়ির এ বাড়িতে মোট পাঁচজন থাকেন। মনি, নবিতা, ওর বাবা-মা আর দিদা। বাবা-মা সকালেই

বেরিয়ে যান। ফেরেন সন্ধ্যা বেলা। দু ভাইবোনের সঙ্গী তখন শুধুই দিদা।

মনি খেতে বসেনি। দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টিভেজা কাকের মতো চুপচাপ। দিদার দিকে তাকাল। বলল, একটু ভালো করে হাসো না দিদা। নবিতাও বলল– দিদা, একটু হাসো না? তোমাকে হুতোমপ্যাঁচার মতো লাগছে! প্লিজ, হাসো। এই বললাম, নইলে আজ খাবই না।

আফরোজা বেগম হিহি করে হাসি দিয়ে বললেন, এবার হলো তো! খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসো।

আজ কিছু ভালো লাগছে না আফরোজা বেগমের। বাতাসে কীসের যেন গন্ধ। বাইরে তাকালেন, দেখলেন রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাক। কা-কা করছে। দিদা চোখ বন্ধ করলেন। মনি, নবিতা এল। দিদার চুলে বিলি কাটতে লাগল। দিদা চোখ খুললেন। বুঝি ঘুম থেকে উঠলেন। নবিতা বলেই ফেলল– এরই মধ্যে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

দিদা বলতে লাগলেন– তোমাদের দাদু ছিলেন ইয়া বড়ো মানুষ। চাকরি করতেন। দেশটার নাম ছিল তখন পাকিস্তান। আমরা ছিলাম পূর্ব পাকিস্তান অংশে। আরেক অংশের নাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। ওরা আমাদের শাসন করত। শোষণ করত। বঞ্চিত করত সবকিছু থেকে। আমাদের বাংলা ভাষাও কেড়ে নিতে চেয়েছিল। দু ভাইবোন এ কথা শুনে অবাক হলো। হা করে তাকিয়ে রইল দিদার দিকে।

দিদা বলতে লাগলেন– আমরা মুখ বুঁজে ওদের সব অন্যায় সহ্য করি অনেক বছর! তারপর ভোট হয়। আমরাই জিতি। কিন্তু ওরা ক্ষমতা ছাড়ে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আমাদের জাতির পিতা দিলেন স্বাধীনতার ডাক। সেই ডাকে সাড়া দিলেন এ দেশের মুক্তিকামী মানুষ।

দাদুও? নবিতা দিদার কাছে জানতে চাইল।

দিদা বললেন– হ্যাঁ, তোমাদের দাদুও। যুদ্ধ শুরু হলো। ২৫শে মার্চ রাতে ওরা হামলা করল। অসংখ্য মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলল। ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেল কতজনকে! শুনেছি, তাদেরও মেরে ফেলে নির্যাতন করে। তোমাদের দাদুও যুদ্ধে চলে গেলেন। তখন তোমাদের বাবা আমার পেটে। বাসায় একাই থাকতাম। একজন শুধু রাতে থাকত। একটা মেয়ে। কম বয়সি। সারাদিন পাগল সেজে পথে ঘুরে বেড়াত। ও ছিল মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানি সৈন্যদের খবর নিত। পরে মুক্তিযোদ্ধাদের জানাত। পাকিস্তানিদের পক্ষেরও লোক ছিল। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিত। তুলে দিত পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে। ওরা গুলি করে, নির্যাতন করে মেরে ফেলত তাদের। একদিন এক রাজাকার তাকে চিনে ফেলে। তুলে দেয় পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে। আর সে ফিরে আসেনি। তোমার দাদুই তাকে বাসায় থাকতে পাঠিয়েছিল।

মনি, নবিতা একদম চুপ। দিদার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

দিদা বলতে লাগল– তখন সেপ্টেম্বর মাস। দুপুরবেলা। তোমাদের দাদু বাড়িতে এসেছে। সফেদা গাছটায় তখন কাক কাকা করছিল। একবার বাঁশ বাগানে যাচ্ছিল, আবার সফেদা গাছটায় আসছিল। খুব ভয় পেয়ে যাই। বাইরে এসে দেখি, অনেক কাক। সবগুলো একসঙ্গে কাকা করছে। এমন কান ফাটানো চিৎকার আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহকে ডাকতে থাকি। নামাজে বসে যাই। তখনো সালাম ফেরাইনি। হঠাৎ বুট পরা পায়ের শব্দ! থপ থপ থপ থপ...

বলো কী দিদা? ওরা কারা ছিল? মনি জানতে চাইল।

দিদা বলতে লাগল– ওরা সৈন্য! পাকিস্তানি সৈন্য! সঙ্গে রাজাকার। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে। একজন আমার পিঠে ঘা মারে। চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলে আরেকজন। কী রাগ! লাথি মারবে মারবে করেও মারল না ওরা। তোমাদের দাদু কোথায় আছে, জানতে চাইল। বার বার জানতে চাইল। বলিনি। ওরা সারা ঘর খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল তোমাদের দাদুকে! আমার সামনেই গুলি করল। কতগুলো গুলি একসঙ্গে!

আফরোজা বেগম আর কথা বলতে পারছিলেন না। কণ্ঠ আটকে আসছিল। মনে হলো, তার কণ্ঠ কেউ চেপে ধরে আছে। চোখে পানি। টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছে। ভিজে যাচ্ছে শাড়ি। পরনের জামা।

কাকটা তখনো কাকা করছিল। আফরোজা বেগম বাইরে তাকালেন। সফেদা গাছটার সবগুলো পাতা চুপ হয়ে আছে। নড়ছে না। মনে হচ্ছে, কাঁদছে। কাকটার মতো পাতাগুলোও! ■

ঢাকার পথে বিজয় ফুল

শাহানা আফরোজ

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা কত রকমেরই না ফুলের নাম শুনেছে, তাই না? কিন্তু তোমরা এমন একটা ফুলের নাম বলো তো যে ফুল সারা দেশে একসাথে ফুটেছে। আরে তোমরা তো পেরে গেছো দেখছি, হ্যাঁ ঠিক বলেছ সেটি হলো বিজয় ফুল। এই ফুল কোনো গাছে ফুটেনি। বর্তমান সরকারের নির্দেশে ছোট্ট বন্ধুদের হাতের ছোঁয়ায় শাপলার প্রতীক বিজয় ফুল পাচ্ছে নতুন রূপ। ফুলের পাপড়ি ছয়টি বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাকে স্মরণ করাবে। আর মাঝখানের কলিটি হবে ৭ই মার্চের প্রতীক- উন্নত মম শির। সারা দেশের প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থী কাগজ, প্লাস্টিক ও কাপড় সহ নানা উপকরণ দিয়ে তৈরি করছে এ বিজয় ফুল। এই ফুল অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হবে শুভেচ্ছা মূল্যে। আর সেই অর্থ তুলে দেয়া হবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের হাতে।

বিজয় ফুলের ধারণা কীভাবে এল সে সম্পর্কে একটু জেনে নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণ তাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করতে বছরের একটি দিন পোশাকে বিশেষ প্রতীক ধারণ করে থাকেন। যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম প্রতিবছর ১১ই নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত তাদের বীর শহিদদের স্মরণে 'রিমেমব্রন্স ডে' উদযাপন করেন। যে -সব যোদ্ধা এবং সাধারণ মানুষ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, ওইদিন তাদের স্মরণে পোশাকে সবাই লাল পপি ফুল ধারণ করে থাকেন। আমাদেরও আছে গৌরবের ইতিহাস। বিজয় ফুল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রতীক। আর এই ভাবনা থেকে শুরু হয়েছে বিজয় ফুলম তৈরির মিছিল।

প্রতিটি জেলায় সাজ সাজ রব। স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে সবাই। যারা বিভাগীয় বিজয়ী হচ্ছে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে ঢাকায় আসার আর যারা একটু পিছিয়ে আছে তারা নতুন উদ্যোমে শুরু করছে চর্চা। তবে সবাইকেই পুরস্কৃত করছে জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ঢাকা শিল্পকলা একাডেমি প্রস্তুত হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠান করার জন্য। অনেক বিভাগই শেষ করেছে তাদের প্রতিযোগিতা। যেমন: চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় কবিতা রচনা বিষয়ের 'খ' গ্রুপ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে উখিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ইফতিয়া নূর নওশিন। কক্সবাজার জেলার একমাত্র প্রতিযোগী হিসেবে সে চট্টগ্রাম বিভাগের এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। এখন শুধু স্বপ্ন ঢাকায় আসার।

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় বিজয় ফুল প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগ থেকে প্রথম হয়েছে খুলনা বিভাগের খোকসা উপজেলার জানিপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

সিলেট জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে ফেঞ্চুগঞ্জের হাজি করম উল্লাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র শাহরিয়ার ফেরদৌস জাহান।

যশোর জেলা পর্যায়ে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় অভয়নগরের নওয়াপাড়া শংকরপাশা সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির দল 'গ' বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে। জেলা পর্যায়ে সেরা নির্বাচিত হয়েছে।

আমাদের বিজয়ের মাস ডিসেম্বরেই ফুটেছিল বাংলাদেশের সবচাইতে সুন্দর ফুল স্বাধীনতা। পতাকার ঘন সবুজে যে রক্তিম লাল সূর্য উঠেছিল, তারই রূপ আমাদের 'বিজয় ফুল'। বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অক্টোবর মাস থেকে শুরু হয়ে পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে থাকছে বিজয় ফুলের উৎসব। ডিসেম্বরের ১ তারিখ থেকে পুরো ডিসেম্বর মাস আমরা নিজেদের জামা, শার্ট, পাঞ্জাবি, টিশার্টে এই বিজয় ফুল ধারণ করব। 'বিজয়ফুল' হাতে তৈরি হলেও এটি বহন করবে আমাদের ঐতিহাসিক একাত্তরের বিজয়ের স্মৃতি। এবারের বিজয় দিবসে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীর সেনানী এবং সাধারণ মানুষকে স্মরণ করা হবে বিজয় ফুল নিয়ে নতুন আঙ্গিকে। ■

গল্প

বিজয় ফুল

মোহাম্মদ অংকন

সেদিন ইংরেজি শিক্ষক নরেশ চন্দ্র স্যার একটি নোটিশ পড়ে বললেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সারা দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজয় ফুল তৈরির প্রতিযোগিতা হবে। বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীর সেনানী এবং সাধারণ মানুষের

স্মরণে সেই ফুল তৈরি করবে শিক্ষার্থীরা। বিজয় ফুলের কিছু শুভেচ্ছা মূল্যে বিক্রি হবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় করা হবে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার বা প্রতিবন্ধীদের সহায়তার জন্য। প্রতিযোগিতাটি স্কুল, উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে।

স্যারের নোটিশ শুনে সবাই কানাকানি করতে লাগল। 'বিজয় ফুল' কী? সবার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল এ কথাটি।

স্যার খুলে বললেন সব। 'বিজয় ফুল' হলো আমাদের জাতীয় ফুল শাপলা। এই ফুলের ছয়টি পাপড়ি ও একটি কলি থাকবে। ফুলের ছয়টি পাপড়ি বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাকে স্মরণ করাবে এবং মাঝখানের কলিটি ৭ই মার্চের প্রতীক হবে। রঙিন কাগজ কেটে আঠা লাগিয়ে এ ফুল তৈরি করতে হবে। যাদেরটা সুন্দর হবে তারা বিজয়ী হবে এবং পুরস্কৃত হবে।'

স্যারের কথা এবার সবাই বুঝতে পারল।

স্কুল ছুটি হয় বিকালবেলা। তারপর বাড়িতে খেলাধুলা করার সময় থাকে। সেদিন রুপা ও রুমি কোথাও খেলতে গেল না। ফেরার পথে বাজার থেকে কাগজ, আঠা ও পেন্সিল কিনে নিয়ে গিয়েছিল। সেগুলো দিয়ে শাপলা ফুলের মতো করে বিজয় ফুল তৈরি করতে লেগে পড়ল।

প্রথম প্রথম তারা পারছিল না। ঠিকঠাক কাগজ কাটতে পারছিল না। কাগজ ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তবুও ওরা হাল ছাড়েনি। এভাবে ওরা বাড়িতে বিজয় ফুল বানানো শুরু করে ফেলল।

সপ্তাহখানেক পর রুপাদের বিদ্যালয়ে বিজয় ফুল তৈরির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। এতে বিদ্যালয়ের সকল

শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করল। প্রতিযোগিতা শেষে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করলেন।

‘প্রিয় উপস্থিতি, আজকের বিজয় ফুল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রুপা, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে রুপার বোন রুমি এবং...’

এভাবে স্যার দশজনের নাম ঘোষণা করলেন যারা কি না উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করতে যাবে। সেদিন রুপা ও রুমি বেশ আনন্দিত হলো। তারপর বাড়িতে গিয়ে আরো চমৎকার করে বিজয় ফুল তৈরির চেষ্টা করতে থাকল।

দু-তিন দিন পর উপজেলা পর্যায়ে বিজয় ফুল প্রতিযোগিতার আয়োজন অনুষ্ঠিত হলো। সেখানে রুপারা দশজনই অংশগ্রহণ করল। প্রতিযোগিতা শেষে উপজেলা প্রশাসক বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করলেন।

‘উপজেলা পর্যায়ে আজকের বিজয় ফুল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে নূরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী রুপা এবং...’

রুপা নিজের নামটি মাইকে শুনতে পেয়ে খুশিতে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু তার বোন রুমির নাম ও বিদ্যালয়ের অন্যদের নাম শোনা গেল না। রুমি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। রুপা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ‘রুমি, প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে কাঁদতে নেই। আমি তো জিততে পেরেছি। তুমি আমাকে সহযোগিতা কর। আমি জেতা মানেই তোমার জেতা।’

রুমি তার বোনকে সার্বক্ষণিক সাহায্য-সহযোগিতা করতে লাগল। রুপাও আত্মবিশ্বাস নিয়ে আরো সুন্দর করে বিজয় ফুল তৈরি করা শিখতে লাগল। তারপর জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন অনুষ্ঠিত হলো। কিন্তু এবার রুপা আর প্রথম স্থান অধিকার করতে পারল না। সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কান্নাকাটি জুড়ে দিলো। তার বোন রুমি এবার তাকে সান্ত্বনা দিলো।

‘আপু, তুমি তো আমার মতো হেরে যাওনি। এবার দ্বিতীয় হয়েছ তো আরেকবার প্রথম হবে। অতএব তোমাকে আরো সুন্দর করে বিজয় ফুল তৈরি করা শিখতে হবে।’

রুপা রুমির কথায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল এবং চেষ্টা করতে থাকল।

এরপর বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয় ফুল তৈরির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। ফলাফল ঘোষণায় এবার রুপা তৃতীয় স্থান অধিকার করল। সে প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়ল।

‘আমি কোনো দিনই প্রথম হতে পারব না। তাই আমি আর প্রতিযোগিতায় যাব না।’

ওদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক রুপার অসম্মতির কথাটি জানতে পারলেন। বললেন, দেখ রুপা, আমাদের বিদ্যালয়ের শত শত শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে তুমিই একমাত্র বিভাগীয় পর্যায়ে জিতে জাতীয় পর্যায়ে লড়াই করার সুযোগ পেয়েছ। এই সুযোগ কোনো মতেই হাত ছাড়া করা যাবে না। এবার না হয় তৃতীয় হয়েছ, শেষ পর্বে যদি প্রথম হও? হতাশা নয়, চেষ্টা করতে হবে।’

রুপা স্যারদের কথায় প্রেরণা নিয়ে আবারো বিজয় ফুল তৈরির অনুশীলন করতে লাগল।

এল কাঙ্ক্ষিত দিন। রুপা অজপাড়া গাঁয়ের একটি বিদ্যালয় থেকে বিজয় ফুল তৈরির প্রতিযোগিতার জন্য রাজধানী ঢাকায় চলে আসলো। রুপা এত দিনে অনেক সুন্দর করে বিজয় ফুল তৈরি করতে শিখে গেছে। তাই তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। হয়ত ওর বানানো ‘বিজয় ফুল’টিই বিজয়ী হবে। হয়ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে পুরস্কারটা পাবে ও। চোখ বুজলেই রুপা দেখে, ছুটে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ করতালি দিচ্ছে। সাংবাদিকরা ছবি তুলছেন। রুপাকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাচ্ছে। বাবা-মা খুব খুশি। খুশি রুমিও, বলছে, ‘আপু, তুমি প্রমাণ করলে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে চেষ্টা করলে বিজয়ী হওয়া যায়।’

প্রধান শিক্ষক বলছেন, ‘তুমি শুধু বিজয় ফুল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীই হওনি, তুমি আমাদের বিদ্যালয়ের নামটি সারাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছ। তোমাকে ধন্যবাদ।’

আহা, কী আনন্দ-ই না হয় বিজয়ে! এইটুকু ভেবে চোখ খোলে রুপা। ‘বিজয় ফুল’ তৈরির জন্য এগিয়ে যায় ও। ■

শুভ জন্মদিন 'নবারুণ'

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

নবারুণ বন্ধুরা, তোমরা কি জানো? তোমাদের সবার মতো নবারুণেরও একটি জন্মদিন আছে। আর সেটি হলো ১৬ই ডিসেম্বর। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা অর্জর করি মহান স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশের মাটিতে জাতির এই মহা আনন্দের দিনই নবারুণ-এর উদয় হয়। এর আগে ১৯৭০ সালের জুন মাসে (বাংলা ১৩৭৭, আষাঢ়) প্রথম নবারুণ প্রকাশিত হয়। তখন সেটি ছিল পাকিস্তান আমল। সে সময়ে নবারুণের সম্পাদক ছিলেন আব্দুস সাত্তার। তখন পাকিস্তান পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির অফিস ছিল ২৭, নয়াপল্টন।

উনিশ'শ ৭১-এর মার্চ মাস থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধকালীন সময়েও জুন মাস পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এরপর পত্রিকাটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার নতুন করে পথচলা শুরু হয় নবারুণ-এর। স্বাধীনতার পর ৯৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রথম নবারুণ-এর সম্পাদক ছিলেন কাজী আফসার উদ্দিন।

সেই যে শুরু হলো নবারুণ-এর পথচলা আর বিরতি নেই। একের পর এক সংখ্যা বের হচ্ছে। প্রতিটি সংখ্যাই নতুন রূপে, নতুন সাজে, নতুন নতুন বিষয় নিয়ে ছাপা হচ্ছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত নবারুণ-এ বিখ্যাত লেখকদের পাশপাশি নতুন লেখকদেরও হাতেখড়ি হয়।

পৃথিবীর সবকিছু এখন হাতের মুঠোয়। নির্দিষ্ট কোনো কিছুতেই কেউ আটকে থাকতে চায় না। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় নবারুণ। এখন নবারুণ-এর দেখা মিলছে ওয়েবসাইট, ফেসবুক ও নবারুণ মোবাইল অ্যাপ-এর মতো ডিজিটাল মাধ্যমেও। যে কেউ নবারুণ মোবাইল অ্যাপ গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে নবারুণ ডাউনলোড করে পড়তে পারে যখন তখন। আর জানুয়ারি ২০১৮ থেকে সবগুলো সংখ্যাই দেওয়া আছে নবারুণ মোবাইল অ্যাপে।

বন্ধুরা, নবারুণের সঙ্গে থাকো, তোমাদের লেখা এবং আঁকা ছবি পাঠাও। সেই সাথে লিখে জানাও তোমাদের মতামত নবারুণ ফেসবুক ও ই-মেইলে। এছাড়া নবারুণ বাংলা একাডেমিসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বইমেলাতেও উপস্থিত থাকে তোমাদের জন্য। এসো কিন্তু সবাই নবারুণ বন্ধুর সাথে দেখা করতে। ■

নবারুণে

মোহাম্মদ আজহারুল হক

নবারুণে লেখে
ছোটো যারা কবি
নবারুণে আঁকে
ছোটোরা ছবি।
নবারুণে লেখেন
বড়ো যারা লেখক
দেশের নামি,
জ্ঞানী গবেষক।
নবারুণে লেখে
ছোটো-বড়ো সবে
কাঁচাপাকা লেখা
ভালো লাগে তবে।

কমিকস্

দাদুর খোকাবেলা
লেখা ও আঁকা: আবু হাসান
তোমার হাতে ওটা কিসের বই?
দাদু, আমার প্রিয় **'নবারুণ'** পত্রিকা
বলো কী! 'নবারুণ' তো আমারও প্রিয় পত্রিকা!! ছোট বেলায় আমি কত্তো পড়েছি এই পত্রিকা!!!
তাই নাকি!? তাহলে আজ সেই সময়ের গল্পটা বল...
শোনো তাহলে...নবারুণ পত্রিকাটা প্রথম প্রকাশ হয় বাংলাদেশের জন্মের আগে। ১৯৭০ সালের জুন মাসে। অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে। কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জুন মাসে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়...!
তারপর? বলো দাদু...
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্যের সাথে উদয় হয়েছিলো আরো একটি আলোকধারা। আর সেটাই হলো **'নবারুণ'**!
নাতি-কী বলছো দাদু!

রঙিন **নবারুণ** এখন দেখছি আরও রঙিন!
হুম দাদু। আরও অনেক পরিবর্তন এসেছে...
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের সাথে **নবারুণ**ও এগিয়ে চলেছে..
সেটা কেমন?
কীভাবে?
ই-মেইলে লেখা পাঠানো যায়! ফেসবুক পেজ আছে!!
ওমা তাই নাকি! এতো বিরাট সুখবর...
২০১৭ সালে বিজয়ের মাসে "নবারুণ" অ্যাপস প্রকাশ করেছে। যা দিয়ে ঘরে বসেই পত্রিকাটি পড়া যায়...মানে **ডিজিটাল পত্রিকা!**

নিবন্ধ

কিছু প্রাণের স্বপ্ন

পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ

মো. তোফাজ্জল হোসেন

সবুজ-শ্যামল আমাদের এই সোনার বাংলাদেশ। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, ততই কেমন যেন বদলে যাচ্ছে আমাদের এই চির চেনা প্রকৃতিটা। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। অতিরিক্ত মানুষের বিভিন্ন চাহিদা পূরণার্থে কমছে গাছপালা। মানুষের সার্বিক প্রয়োজন আর চাহিদাও বেড়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। আর প্রয়োজনের উচ্ছিষ্ট আজ বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য। বিভিন্ন কারণে বর্জ্য ও আবর্জনার ব্যবস্থাপনার সঠিকতার অভাবে ও কিছু জনগণের অসচেতনতার জন্য আমাদের এলাকা, আমাদের শহর, আমাদের দেশ দূষিত হয়ে চলেছে।

এত সব সমস্যাক্লিষ্ট এই দেশেও রয়েছে কিছু স্বপ্নরাঙা মানুষ। হয়ত নানাবিধ সমস্যায় পর্যুদস্ত দেশের বিশাল সমস্যার ভাণ্ডার সমাধান করে তারা আলাদীন এর দৈত্যের মতো দেশকে বদলে দিতে পারে না, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য নিরলস কাজ করে যায়।

এমন মানুষদেরই একটি দল কাজ করছে ময়মনসিংহ নগরীতে। নগরীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী রাখতে, পরিচ্ছন্ন নগরীর স্বপ্ন বুকে নিয়ে মাঠে নেমেছে বিডি ক্লিন ময়মনসিংহ-এর কর্মীরা। এমনটাই শোনা যায় বিডি ক্লিন ময়মনসিংহ-এর নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবক জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র মোশাররফ হোসেন রাজুর কণ্ঠে। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি সচেতন নাগরিক হিসেবে দেশের প্রতি আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে, সেই থেকেই একটা প্লাটফর্মে এসে দেশের জন্য কাজ করছি।'

পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশের স্বপ্ন শুরুটা এখানেই, শেষ করার দায়িত্ব সবার। মিলেমিশে একসাথে বদলে দেবো দেশটাকে-এই স্লোগানগুলোকে সামনে নিয়ে ৩রা সেপ্টেম্বর ২০১৬ তে ময়মনসিংহ শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় বিডি ক্লিন ময়মনসিংহ-এর।

বিডি ক্লিন ময়মনসিংহ যা ময়মনসিংহ ক্লিন নামে পরিচিত, কাজ করছে মানুষের অভ্যাস পরিবর্তনের আন্দোলন হিসেবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি দেশের স্বপ্ন নিয়ে বিডি ক্লিন (ঢাকা) এর আদলে ও অনুপ্রেরণায় বিডি ক্লিন-ময়মনসিংহ এর যাত্রা শুরু। প্রাথমিকভাবে বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহকে একটি পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে তুলে ধরতে কাজ করছে এই

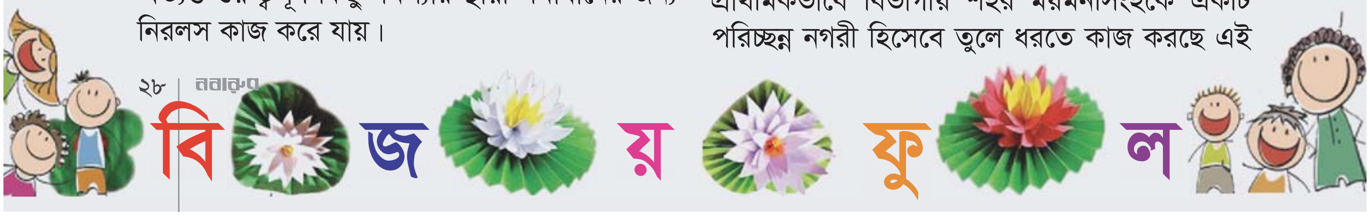

সংগঠনটি। খুব শীঘ্রই ময়মনসিংহ বিভাগের অন্যান্য জেলা ও উপজেলাগুলোতেও বিস্তৃতি ঘটবে এর।

প্রায় ৪ শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও যেখানে-সেখানে ময়লা না ফেলার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে প্রতি সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে ময়মনসিংহ শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্নভাবে মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তুলতে ইভেন্ট এর আয়োজন করে চলেছে। শুধু মুখে মুখে সচেতনতার কথা বলেই ক্ষান্ত নয় তারা, আপামর সাধারণ মানুষদের পরিচ্ছন্নতার কাজে যুক্ত করার স্বার্থে, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তারা ঝাড়ু-কোদাল-ঝুড়ি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন স্পটে। ইতোমধ্যে এক বছরেরও কম সময়ের মাঝে সংগঠনটির শতাধিক ইভেন্ট-এ যোগ দিয়েছে অন্তত কয়েক হাজার মানুষ। একাত্মতা ঘোষণা করেছেন ময়মনসিংহের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

বিডি ক্লিন-এর কর্মী মাহবুবুর রহমান হৃদয় জানায়, যতদিন মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা যাবে না, ততদিন শহর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব নয়। তাই তারা শহরের রাস্তা বা পাবলিক স্থান পরিষ্কার করতে ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে কাজ করে থাকে। কোরবানির পশুর বর্জ্য ডাস্টবিনে ফেলতে ও এলাকা পরিষ্কার রাখতে শহরময় স্টিকার ক্যাম্পেইন আয়োজন করে ময়মনসিংহ ক্লিন, যা সফলতা লাভ করে আশানুরূপভাবে। ময়মনসিংহ ক্লিন পরিষ্কার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে নিয়ে মতামত সভা বা পরিচিতি অনুষ্ঠান করে থাকে। এখানে যোগ দিতে বয়সের কোনো তফাৎ নেই। নেই কোনো যোগ্যতার ধরাবাঁধা নিয়ম। শুধু একটা সুন্দর মন দরকার, দরকার ভালো কাজ করার, দেশের জন্য কাজ করার মানসিকতা। মোট স্বেচ্ছাসেবকদের প্রায় ৭০% ছাত্রছাত্রী। তারা পড়ালেখার ফাঁকে অবসর সময়ে এখানে কাজ করে। বড়ো-ছোটো সবাই এক সারিতে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে তারা। আরেক নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবক লুৎফুন্নাহার লিজার ভাষ্য মতে, আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, সবাইকে নিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ে তোলা।

বিডি ক্লিন ময়মনসিংহের প্রধান সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান ফয়সাল বলেন, আমরা নিজেদের অজ্ঞাতে বা জ্ঞাতসারে নিজেরাই আমাদের চারপাশ ময়লা করছি, অথচ চাইলেই পরিষ্কার রাখা সম্ভব, সেটিই মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি, এ কাজে সকলের সহযোগিতা পাব। কারণ পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ সবারই কাম্য। ■

দ্বাদশ শ্রেণি, অ্যাডভান্সড রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ময়মনসিংহ।

বেগম রোকেয়া

আতিক আজিজ

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের ছিল উদার মন-প্রাণ
নারী জাগরণের মহা মন্ত্র বাঙালিদের করলেন দান।
আঠারো শ' আশি নয় ডিসেম্বর পায়রাবন্দ গ্রামে
রংপুর জেলার মিঠাপুকুর চেনে সবাই এক নামে।
জহিরুদ্দিন বাবার আদরে আলোকিত করলেন দেশ
মাতা সাবেরা চৌধুরীর গর্বের ছিল না শেষ।
সমাজ, সংসার, নারীর অধিকার শিক্ষা কর্মের জন্য
রক্ষণশীলতা গোঁড়ামি দূর করে তিনি হলেন ধন্য।
অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন লিখেছেন পদ্মরাগ
আইনগত ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে দূর করলেন মনের দাগ।
নারী জাগরণের অগ্রদূত তিনি নারী সমাজের প্রাণ
তাঁর মহৎ কর্মের জন্য বাঙালি গায় বিজয় গান।

[জন্ম: ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮০
মৃত্যু: ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩২]

আমার বাংলাদেশ

আব্দুল্লাহ নোমান

আমার দেশ বাংলাদেশ।
সৌন্দর্যের নাই তো শেষ
কোকিল ডাকে গাছের ডালে
মাঠে ডাকে গরু
বনে আছে রং-বেরঙের
গাছ, লতা ও তরু।
শিশির জলে ভিজে যাওয়া
এতই সুন্দর পরিবেশ।
নদীর বুকে মাঝির গান
কতই সুন্দর বাংলাদেশ।

৮ম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জীবনে

শাশ্বত ওসমান

জীবন তো যাচ্ছে বয়ে
নদীর স্রোতের মতো
এখন যা চলমান বহমান
একটু পরেই তা গত।
এই বহমান জীবন
রাখতে হবে স্বপ্ন-বীজে
সবুজ পত্র-পল্লবে শোভিত হবে
যা তুমি বপন করেছিলে নিজে।
ভালো কিছু যখন দেখবে
মানুষ কিংবা জীবে
নিজের করে তখনই তা
আগ্রহ ভরে নেবে।
যত্ন করে শাসন করবে
পরিণত করবে তা অভ্যাসে
তবেই তো জীবন তোমার
ভরে উঠবে উল্লাসে।
জীবনে যোগ কর যেখানে
পাও অনুকরণীয় যত
ছোটো ছোটো সাফল্যে
জীবন তোমার হবে ঋদ্ধ।

কর্ণফুলি নামে

ফারুক হাসান

একটি কানের দুল হারিয়ে
কর্ণফুলি নামে
সেই ইতিহাস পৌঁছে যাবে
ঢেউ খেলানো খামে।
কন্যা তুমি ঝরাও কেন
চোখে তোমার জল
কান্না গুলো পান্না হয়ে
ছুটছে অবিকল।
কর্ণফুলীর নামে দেখি
আলোর ঝিকিমিকি
চাঁদ তারাতে জোছনা যেন
জ্বলছে ধিকিধিকি।

চাঁদের হাট

স্বপন মোহাম্মদ কামাল

লিখছ তুমি পাখির ছড়া ফুলের ছড়া আর
শিশু মনের কথাগুলি লিখছ চমৎকার,
তোমার লেখা পড়ে সবাই প্রাণটা খুলে হাসে
শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ, যুবক খুশির ভেলায় ভাসে।

মনের ভেতর গন্ধ ছড়ায় ছন্দ কথার মালা
জাদুর চাবি খুলছে যেন বন্ধ ঘরের তালা,
অচিন দেশের দ্বার খুলে যায় তোমার লেখা পড়ে
তোমার ছড়ায় ছোট্ট মণি বসছে নড়েচড়ে।

লিখছ তুমি শহর নগর নদীর কলতান
শ্রাবণ মাসে যেই নদীতে ডাকবে স্রোতের বান,
যে গ্রাম জুড়ে নানা রকম ভোরের পাখি ডাকা
সেই ছবিটি কি মনোরম তোমার ছড়ায় আঁকা।

জ্ঞানী গুণী মহৎ জনের গাইছ জয়গাঁথা
যে গরিবের মাঘের শীতে নেই তো কোনো কাঁথা,
তাদের কথা লিখছ তুমি দরদ ভরা মনে
ছড়িয়ে পড়ুক তোমার ছড়া সাহিত্য অঙ্গনে।

কত ছড়া-ই লিখলে তুমি জীবন পরিক্রমে
আরো কত পদ্য তোমার হৃদয় পটে জমে,
সে-সব লেখা কালের পাতায় হবে উদ্ভাসিত
দীপ্ত মেধায় ছন্দ ছড়ায় তুমি যে আজ নীত।

দূরের একটি সুবর্ণ গ্রাম স্বপ্ন আঁকা চোখে
একসাথে আজ মিলে হাঁটি প্রভাত সূর্যালোকে,
সেই জগতেই করব সবাই কাব্য ছড়ার পাঠ
আমাদের এই লেখনীতেই জমবে চাঁদের হাট।

ঋতুর হিসাব

স্বপন শর্মা

ঋতুর হিসাব দিনে দিনে
মেলে না আর ঠিক,
কালের হাওয়া বদলে গেছে
পরিবর্তন চারদিক।
পাঠ্য বইয়ে ছয়টি ঋতুর
হিসাব আছে জানা,
বছর জুড়ে ছয় ঋতু হয়
পাই না তার ঠিকানা।
দু'মাসে হয় একটি ঋতু!
সেটাও হয় না আর,
প্রকৃতির আজ পরিবর্তন
হিসেব পরিষ্কার।
বর্ষা শরৎ বর্তমান তো
গ্রীষ্ম হয়েই আসে,
বসন্ত আর হেমন্ত আজ
বিলীন শীতের কাছে।
কারণটা কী? হিসাব দেখি
একেবারে পাকা
মানুষ-জনের অত্যাচারে
প্রকৃতি আজ ফাঁকা।

শিশুর আকাঙ্ক্ষা

লিয়াকত আলী চৌধুরী

শিশুরা জেগে রয়েছে যে আশালয়ে
তারাই আকাঙ্ক্ষার বাতাস আনে বয়ে।
মূর্খরা শুকনা কাঠের সমতুল্য
জ্ঞান শিশুর জন্য সম্পদ অমূল্য।
খেয়ালের ধ্যানে শিশু প্রতিভা পাই,
দিশাহারা ফকির প্রাণে পেল ঠাঁই।
শিশুর মনে এক শান্তি হলো যুক্ত,
জ্ঞান পেয়ে চিন্তা-ভাবনা হয় মুক্ত।
ওরাই জাগিয়ে তোলে উন্নত শির,
আলো অন্তরে বেঁধে নিয়ে শিশু বীর।
শান্তি পায় তাদের বাসনার বুক,
শিশুর মনে এল স্বর্গের সুখ।

মেঘের দেশে

শরীফ আব্দুল হাই

ইচ্ছে করে মেঘের দেশে
যাই উড়ে যাই উড়ে
মেঘের ভেলায় ভেসে ভেসে
দেশটা দেখি ঘুরে।
দেশটাতে কি আছে কেবল
মেঘের জলরাশি ?
কেমন করে মেঘগুলো সব
যায় যে ভাসি ভাসি ?
পাহাড় নদী ঝর্ণাধারা
বয় কি ছলছল ?
তা না হলে মেঘের ভেলা
ভাসে কোথায় বল ?
ওসব কিছুই ঘুরে ঘুরে
দেখতে ইচ্ছে করে,
মনটা যে তাই চায় যে যেতে
মেঘের ভেলায় চড়ে।

পাখির পাঁচালি

সামসুন্নাহার ফারুক

রোজ ভোরে ঘুম ভাঙে পাখিদের গানে
কি মধুর ডাকাডাকি দোলা লাগে প্রাণে
কেউ ডাকে কিট্ কিট্ কেউ দেয় শীষ
এক সাথে ঝাঁক বেঁধে কি যে মিলমিশ।
বউ কথা কও ডাকে বধূয়া উতল
সোহাগের আরশিতে মন চঞ্চল
চুলবুলি বুলবুলি ঘুরে ঘুরে নাচে
চোখ গেল কোথা যেন ডেকে ওঠে কাছে।
বাক বাকুম পায়রা খুঁটে খায় দানা
ময়নাটা গায় সুখে তানা নানা নানা
মাছরাঙা ডালে বসে শিকার খেয়ালে
টুনটুনি টুনটুন সুখের বেহালে
দরজি বাবুই বুনে তালগাছে বাসা
মৃদু হাওয়ায় দোলে কি যে লাগে খাসা।

অতিথি

হামীম রায়হান

হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে-
আসলো যে অতিথি,
সাদর আমন্ত্রণ তাদের,
জানাই মনের প্রীতি।
নদী, খাল, বিল ও হাওড়ে-
বসবে তাদের মেলা,
নাচে, গানে মুখরিত-
চলবে নানান খেলা।
কত রকম বাহার তাদের,
কত তাদের রূপ,
শীত এলে আসে তারা,
দেখতে মজা খুব।
আসলে তারা, পড়ে সাড়া,
জাগে পরিবেশ।
এই অতিথির জন্মভূমি-
সাইবেরিয়া দেশ।

মেঘ ও আকাশ

চন্দনকৃষ্ণ পাল

এই জানালায় আকাশ দেখি
ঐ জানালায় বিল,
পদ্মফুলের আলো নিয়ে
বিল করে ঝিলমিল।

বিলের পাড়ে কালচে সবুজ
গাছ-গাছালির সারি,
গাছ-গাছালির ভিড়ের ভেতর
মেঘকন্যার বাড়ি।

মেঘ কন্যার বাড়ি তো নয়
বাগান ভরা ফুল,
সে বাগানে রোদে শুকোয়
মেঘ কন্যার চুল।

মেঘ কন্যার চুল ভেজাল
দুষ্ট মেঘের দল,
বন্ধুরা সব কোথায় তোরা
মেঘের বাড়ি চল।

মেঘের সাথে আড়ি দেবো
খেলব না আর খেলা,
নীল আকাশ আর সবুজ দেখে
কাটিয়ে দেবো বেলা।

মেঘের দল বুঝবে তখন
দুষ্টুমি নয় ভালো
বৃষ্টি হয়ে ঝরে ঝরে
ফিরিয়ে দেবো আলো।

হাততালিতে ভরিয়ে দেবো
মাঠ-প্রান্তর গ্রাম,
হাসবে আকাশ বলবে ডেকে

এই আমাদের নাম।

সেই পাখিটির খোঁজে

মুস্তফা হাবীব

যে পাখিটি গাইতে পারে
মনকাড়া সব গান,
সেই পাখিটির খোঁজে আমার
মন করে আনচান।

যে পাখিটি হাসতে পারে
মিষ্টি মধুর হাসি,
সেই পাখিটির জন্য জমা
ভালোবাসার বাসি।

যে পাখিটি নাচতে পারে
পায়ে ছন্দ তুলে,
সেই পাখিটির জন্য মালা
গাঁথব আমি ফুলে।
যে পাখিটির বুকে আছে
খাঁটি প্রেমের টান,
সেই পাখিটির জন্য আমি
লিখব হাজার গান।

যে পাখিটি শিল্পী হয়ে
বোনে পাতার বাসা,
সেই পাখিটি আমার হবে
এইটুকু মোর আশা।

অতিথি পাখি

নাজমা বেগম

নদী নালা পেরিয়ে
হাজার মাইল ছাড়িয়ে
আসছে অতিথি পাখি
তাদের দেখে জুড়ায় আঁখি

শীত প্রধান দেশ থেকে
তাদের আগমন
কিচির মিচিরে নদী গাঙ
মুখরিত সারাক্ষণ

বাংলাদেশের রূপ

লিটন ঘোষ জয়

সেদিন বসে নদীর পাড়ে
এই ছবিটা আঁকা
দেখেছিলাম নদী তখন
ছুটছে আঁকাবাঁকা।

ইচ্ছে তো হয় পাখি আঁকি
ধান সবুজের মাঠ
প্রজাপতির ডানার রঙে
রঙিন করি ঘাট।

রংধনুর ওই রংটা দিয়ে
রাঙিয়ে তুলি ঘর
ফুলে ফুলে সাজিয়ে রাখি
শূন্য নদীর চর।

ঘাসের ফড়িং মেলুক পাখা
ডাকুক কুহু-কেকা
বাংলাদেশের রূপের টানে
আমার ছড়া লেখা।

অনুভূতি

মনসুর জোয়ারদার

কোকিলের সুর শুনে কুহুকুহু
দোয়েলের ডাক শুনে মুহুর্মুহু
একটি কথাই শুধু মনকে দোলায়
থাকব পড়ে এই বাংলাদেশে, ভালোবেসে।
রাতের শিশির ভেজা সকাল বেলায়
যখন গোলাপ ফুটে গন্ধ ছড়ায়
মমতা ভরা সেই মধুর ক্ষণে
কত সুখী মনে হয় স্বাধীন বেশে, বাংলাদেশে।
কলমি লতায় ভরা ঝিলের শোভায়
যখন ভ্রমর ওড়ে রঙিন আশায়
চোখের দেখা সেই ছবির কথা
সুর হয়ে যেন ঘোরে বাউল বেশে, আশেপাশে।

জন্মভূমি

নেহা হোসেন

আমার জন্মভূমি
আমার প্রাণের দেশ
ছয় ঋতুতে সেজে থাকা
আমার সোনার বাংলাদেশ।

দেশটি আমার শিল্পীর হাতে
আঁচড় কাটা তুলি
এদেশেরই বাংলা ভাষা
আমার মুখের বুলি।

৭ম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

সৎ লোক

মানসুর মুজাম্মিল

সৎ লোক দিতে পারে গোলাপের গন্ধ
দিতে পারে ভালোবাসা, কবিতার ছন্দ।

দিতে পারে জীবনের পুষ্পিত গতি
রোধ করে দিতে পারে কালো আর ক্ষতি।

সৎ লোক দিতে পারে দয়া মায়া বন্ধন
দিতে পারে বর্ণিল আলোকিত নন্দন।

সৎ লোক বেঁচে থাকে কথা আর কার্যে
বেঁচে থাকে দিল খোলা মানুষের রাজ্যে।

আর দেখা যায়নি

সৈয়দা নাদিয়া হক

আমি সাবির। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। আমার বাবা পুলিশ অফিসার। তোমরা ভাবতে পারো যে, বাবা পুলিশ, তাহলে তো খুব ভাব নিয়ে চলা যায়। কিন্তু আমার সবচেয়ে বিরক্তিকর জিনিস হলো তেলাপোকা, বেগুনভর্তা, লেখাপড়া ও বাবার এই পুলিশের চাকরি। এই চাকরির জন্যই আমার জীবনে একটা বন্ধুও নেই। যখন-তখন বাবার বদলি হচ্ছে, যার কারণে কিছুদিন পর পর নতুন জায়গায় যেতে হয়। আমি ভালো কোনো বন্ধু বানাতে পারছি না। বেস্ট ফ্রেন্ড কাকে বলে সেটাই আমি জানি না। যাই হোক, মায়ের কথা বলা যাক। আমার মা গৃহিণী। গৃহিণী হলেও আমার মনে হয়, পুলিশের চাকরিটা মা বেশ ভালোই করতে পারত। সবসময় কোথায় যাচ্ছিস? কেন যাচ্ছিস? কী করবি? আরো কত প্রশ্ন বাপরে...বাপ।

যাই হোক। সবচেয়ে মজার জিনিসটা এবার বলা যাক। আজ আমার জন্মদিন। আজ এই দিনে আমরা আবার বদলি হয়ে নতুন জায়গায় এলাম। সারাদিন সব গোছগাছ করতে করতে রাত হয়ে গেল। বাবা এখানে একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে ভর্তির আলাপ করে রেখেছে। কাল সকালে আমি নতুন স্কুলে যাব। দেখি কেমন বন্ধু পাই।

‘সাবির তাড়াতাড়ি ওঠ, আজ স্কুলের প্রথমদিন, আজই দেরি করে যাবি নাকি? ওঠ, নয়তো মুখে পানি ঢেলে দিবো।’

‘উহ্ মা, সকাল হতে না হতেই শুরু করে দিলে।’

যাই হোক, উঠতে তো হবেই। মা কথাটা খারাপ বলেনি। প্রথমদিন একটু আগেই যাওয়া উচিত। তাড়াহুড়ো করে কোনো রকম নাশতা করে তৈরি হয়ে গেলাম। এবার গাড়িতে উঠলাম। স্কুলে যাওয়ার সময় নতুন জায়গার নতুন মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে গেলাম। অবশেষে স্কুল গেটের সামনে এসে থামল গাড়িটা।

মাঠে ছেলে-মেয়েরা ছুটাছুটি করছে। দোলনায় বসে কিছু মেয়ে দোল খাচ্ছে। আর কিছু মেয়ে মিলে কুত্কুত্ খেলছে। তার মধ্যে চোখে পড়ল একটা ছেলেকে। সে সবার চেয়ে আলাদা। সবার পোশাকের চেয়ে তার পোশাকটা উজ্জ্বল, সে দেখতেও খুব সুন্দর, ফর্সা। চোখগুলো ছোটো ছোটো। চুলগুলো খাড়া। সে একটা গাছের সঙ্গে কথা বলছে বলেই মনে হচ্ছে।

আমি সতর্কতার সাথে আমার ক্লাসটা চিনে নিয়ে পিছনের দিকে বসলাম। সবাই বাইরে, এখনো কেউ ক্লাসে আসেনি। ওয়ার্নিং দেওয়ার পর নিশ্চয়ই সবাই এসে বসবে। তখন সবার সাথে কথা বলব। ক্লাসটা একদম খালি। সামনের দিকটা দেখে আমার পিছনের দিকটায় তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম! একটা ছেলে বসে আছে এখানে। চোখগুলো ছোটো চুলগুলো খাড়া। আরে এ তো সেই ছেলেটা! সে আমাকে বলল, ‘তুমি আজ নতুন?’ হ্যাঁ আমি আজ নতুন এসেছি।

তোমার নাম কী?

আমার নাম সাবির।

ছেলেটির চোখ স্থির, যেন আমার মধ্যে কিছু একটা লক্ষ করছে ও।

আমিও আজ নতুন এসেছি।

বাহ! ভালোই তো দুজনই নতুন। আমরা দুজনে এভাবে নানা ধরনের কথা বলতে থাকলাম। হঠাৎ ওয়ার্নিং শুনতে পেলাম। ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রী ক্লাসে এসে বসল। সবাই এক পলক আমার দিকে তাকাল। স্বাভাবিক, আমি নতুন আমার দিকে তো তাকাবেই। আমিও তাই করতাম।

কিন্তু ছেলেটার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না কেন? ও তো নতুন এসেছে। আমার পাশে এসে কালো একটা ছেলে বসল। ছেলেটা মনে হচ্ছে খুব মিশুক। এসেই হাসিমুখে আমার নাম জিজ্ঞেস করল।

আমি বললাম, ‘আমার নাম সাবির।’

এমন সময় একজন ম্যাডাম এসে ক্লাসে ঢুকলেন। ম্যাডামের দেহ এত লিকলিকে যে, মনে হয় ঝড় এলেই উড়ে যাবে। চোখে একটা কালো ফ্রেমের চশমা। পরনে বাসন্তি রঙের শাড়ি। একবার দেখলেই মনে হয় রোগা। রোগা ম্যাডামটা এসেই খাতাটা টেবিলের উপর রাখল আর বোর্ডটা মুছলেন। দেখলেই বোঝা যায় খুব গোছানো। নাম ডাকার পর প্রথমেই রোগা ম্যাডামের চোখ পড়ল আমার দিকে।

একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর আমাদের বাংলা পড়ানো শুরু করলেন। খুব সুন্দর করে আমাদের পড়া বুঝিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে তিনটা ক্লাস চলে গেল। এর মধ্যে পিছনের ছেলেটার কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছি। ক্লাস চলাকালে ওর দিকে তাকানোই হয়নি।

ক্লাসের মধ্যেই পাশের কালো ছেলেটির সাথে নানা রকম কথা হলো। ওর নাম আমিন। ও কবিতা লিখতে পছন্দ করে। কয়েকটা কবিতা আমাকে দেখাল। কথা আর বেশি বলতে পারলাম না। টিফিনের পর আমিনের ছুটি নিয়ে চলে যাওয়ার কথা। আজ ওর মামা আসবে বিদেশ থেকে।

আমিনকে বিদায় দিয়ে স্কুলের মাঠটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। সবাই যার যার মতো খেলছে, ঘুরছে। হঠাৎ আবার ওই ছেলেটাকে দেখতে পেলাম। নামটা যেন কী? জিজ্ঞেস করাই হলো না। যাই এর সাথে কথা বলি। আবারো ছেলেটা গাছের সাথে কী যেন একটা করছে। খুব অদ্ভূত!

কী খবর? কী করছ?

কিছু না দাঁড়িয়ে ছিলাম। নতুন এসেছি এখনো কোনো বন্ধু হয়নি তাই সময় পেলেই এখানে এসে একটু বসি।

তোমার বাসা কোথায়?

আমাদের বাসা! চিনবে না। শুধু শুধু বলে আর লাভ কী? তোমার সাথে আমার একটা কথা ছিল।

কথা তো অনেকেই আছে। কিন্তু আমার বাসার কথা তো কিছু জিজ্ঞেস করলে না?

আমি জানি।

জানি মানে? তুমি জানো আমার বাসা কোথায়?

হ্যাঁ।

কীভাবে জানো?

না মানে...মানে তুমিই তো সকালে বললে।

আমি? কোথায়?

যাই হোক, হয়ত বলেছি।

এমন সময় ঘণ্টা পড়ল, টিফিন টাইম শেষ। ক্লাসে গিয়ে বসলাম। ক্লাসে গিয়ে আর কথা হলো না। স্কুল ছুটি হলে পিছনে ফিরে দেখি ছেলেটি নেই। কীভাবে সে আগে বেরিয়ে গেল? স্কুল থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে একা একা হাঁটা শুরু করলাম। একটু পর দেখি, ছেলেটা যাচ্ছে। বললাম, চলো গল্প করতে করতে যাই। ও বলল, সাবির, আমি তোমাকে কাল একটা জায়গায় নিয়ে যাব।

কোথায়?

গেলেই দেখতে পাবে। কাল সকালে আগে আগে এসো। তাহলে আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।

ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন যাই।

পরদিন সকালবেলা। স্কুলে যেতে যেতে গাছপালায় ঘেরা একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে ডাক এল।

সাবির! সাবির! এই তো এইদিকে...।

খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখি এ তো সেই ছেলেটি! কাল যে বলেছিল কোথাও নিয়ে যাবে। যাই দেখি, এদিকেই মনে হয় নিয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে তুমি কী করছ?'

তোমার মনে নেই? আমি তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব বলেছিলাম। চলো, এদিকে সেই জায়গাটা।

আমরা হাঁটা শুরু করলাম। হঠাৎ মনে হলো ছেলেটার হাতটা কেমন যেন ঠান্ডা আর অনেক হালকা। আমার শরীরটা হঠাৎ শিরশির করে উঠল। আচ্ছা! ছেলেটার নামটা তো জানা হলো না! এই তোমার নাম কী?

বলছি। আগে চল ওখানে।

একটা পুরনো বাড়ির সামনে এলাম আমরা। বাড়িটা দেখলে কেমন যেন ভয় লাগে। আমি বললাম, এখানে কেন এসেছ?

ছেলেটা আজব হাসি দিয়ে বলল, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।

আমি অবাক হয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকি। ইটের তৈরি খুব ছোটো একটা বাড়ি। আশপাশে গা ছমছম করা পরিবেশ। ঠিক যখন বাড়ির ভিতরে পা দিব তখনই কে যেন সাবির বলে চিৎকার করে একটা ডাক দিল। পিছনে ঘুরে দেখি আমিন। আমিন কেন আমাকে এভাবে ডাকছে! আমিন চিৎকার করে বলছে, সাবির কোথায় যাচ্ছিস? তাড়াতাড়ি এদিকে আয়।

আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। ঠিক তখনই পাশে তাকিয়ে দেখলাম ছেলেটি নেই। দৌড়ে গিয়ে আমিনকে জড়িয়ে ধরলাম। তখনো আমার বুক কাঁপছিল। পানি খেয়ে ঠিক হয়ে নিলাম। সব শোনার পর আমিন বলল, স্কুলে চল। নয়তো দেরি হয়ে যাবে।

যাওয়ার সময় আমিন আর একটা কথাও বলল না। স্কুলে গিয়ে দেখি এখনো সবাই আসেনি। তখন আমিন ব্যাগ রেখে জায়গায় বসল। আর আমাকে বলল, শোন সাবির, তুই যে বাড়িটায় যাচ্ছিলি সেখানে অনেকদিন ধরে কেউ যায় না। পাঁচ বছর আগে একটা লোক সেখানে গিয়েছিল সেও আর ফিরে আসেনি। ওই জঙ্গলে যদি কোনো গরু-ছাগল ঢুকে যায় তাহলেও কোনো মানুষ তাদের খুঁজতে যায় না।

আমিন জানাল, আমাদের ক্লাসে আমি ছাড়া নতুন আর কেউ আসেনি। নতুন কেউ আসলে তো ওরা সবাই দেখতে পেত।

কথাগুলো শোনার পর আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। সেদিন আর ক্লাসেও মন বসল না। বাড়ি যাওয়ার পর রাতে অনেক জ্বর আসলো।

অতঃপর সব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে গেলেও ছেলেটাকে আর কখনো দেখা যায়নি। অনেকদিন পর পর রাতে ওকে স্বপ্নে দেখি। যেদিন রাতে স্বপ্ন দেখি, সেদিন আমার মনটা খুব খারাপ হয়। কেন, জানি না। ■

৮ম শ্রেণি, সানারপাড় শেখ মোরতোজা আলী উচ্চ বিদ্যালয়, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

আলু কাহিনি

ক্বণন মাহমুদ নিয়োগী

মাহিরের আলু খুব প্রিয়। আলু সিদ্ধ, আলু ভর্তা, আলু ভাজি আরো যা যা মন চায় তাই মায়ের কাছে চায়। মা প্রথম প্রথম দিতেন কিন্তু এখন মাঝে মাঝে রাগ করেন। আজকেও যখন সে আলু ভর্তার কথা বলল- তখন মা রেগে গিয়ে বলেন, 'এ দুনিয়ায় কি শুধু আলুই তোর খাবার? আর কিছুই কি খাবি না? আলু খেয়ে খেয়ে একদিন দেখবি তুইও আলুর মতো হয়ে গেছিস।'

মায়ের কথা শুনে মাহির হাসে। সে বলে, 'কী বলছ, সবকিছু আলুর তৈরি হলে তো ভালোই হয়।'

একদিন মাহির ঘুম থেকে উঠে দেখে সে যে বিছানায় শুয়ে আছে তার চারপাশে অনেক আলু। যেন আলুর গাছ গজিয়েছে। তার মনে হলো নাশতায় আলুর তরকারি আছে। তার জিভে জল চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে সে চলে গেল নাশতা খেতে। টেবিল দেখে তো সে অবাক। টেবিলে পড়ে আছে আলুর পরোটা। তার কত প্রিয় খাবার। বেশ আয়েশ করে সাবাড় করল সব। মা বলল, 'লাগলে আরো দেবো। যত ইচ্ছে খা।'

'না মা, পেট ভরে গেছে', বলল মাহির।

আলু দিয়ে শুরু, তাহলে দিনটা ভালোই যাবে মনে হয়। বাইরে সে খেলতে বেরুচ্ছে। বেরুনোর সময় তো তার চক্ষু চরকগাছ! চারদিকে দেখে আলু আর আলু। গাছে, মাটিতে, রাস্তায়-এত আলু কোথা থেকে এল! তার আনন্দ দেখে কে!

এমন সময় ওর বন্ধু তকির সঙ্গে দেখা। তকি বলল, 'দোস্ত, নতুন এক সিনেমা এসেছে, যাবি আমার সঙ্গে?'

সিনেমা পাগল বন্ধুকে মাহির না বলতে পারল না। গেল তার সঙ্গে। কিন্তু একি! সিনেমা হলে কোনো সিনেমা নেই। তার বদলে আলু কীভাবে উৎপাদন করা হয় সেটার ওপর একটা দুই ঘণ্টার প্রামাণ্যচিত্র। সে ভাবল, 'ব্যাপার কী? চারপাশে এত আলু কেন? যাক, সমস্যা কী? আলুই তো! এমন ভালো জিনিস আর হয় না।'

সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার, রাতের খাবার সবকিছুতে শুধু আলু। মাহিরের খেতেও ক্লান্তি নেই। এমন করে তিন দিন চলে গেল। তিন দিন শুধু আলু খেয়ে চার দিনের মাথায় আলুর প্রতি কিছুটা বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছে। আর খেতে মন চায় না। সে দোকানে গেল অন্য কিছু খাওয়ার জন্য। কিছু চকলেট কিনল। এই চকলেটের প্যাকেট আগে দেখেনি সে। মনে হয় বাজারে নতুন এসেছে। প্যাকেট খুলে মুখে দিয়েই ওয়াক করে দিল। 'একি! কীসের চকলেট?' ভাবল মাহির। তারপর রেগেমেগে দোকানিকে জিজ্ঞেস করল, 'কীসের ফ্লেভার এতে?'

দোকানি হাসতে হাসতে বলল, 'ভাইগনা, আলুর ফ্লেভার। দারুণ খেতে।'

দোকানির কথা শুনে মাহির পাগল হওয়ার অবস্থা। সে দোকানের ভেতরটা ভালো করে দেখল। আলুর চপ, আলুর চিপস, আলুর পাউরুটি, আলুর চুইংগাম, আলু আর আলু। যেখানেই তাকায় সেখানেই আলু। 'না, এই আলু আর না।' রেগেমেগে মাহির মনে মনে বলল।

মাহির দোকান থেকে বের হয়ে এল রাস্তায়। হঠাৎ চোখ পড়ল এক আইসক্রিমওয়ালার দিকে। তখন মাহির জিজ্ঞেস করল, 'আঙ্কেল, কীসের আইসক্রিম আছে?'

আইসক্রিমওয়ালা মুচকি হেসে বলল, 'আলুয়ার, আলুকোণ, কাপ আলু... মেইড উইথ আলু। কোনটা চাই?'

আইসক্রিমওয়ালার কথা শুনে মাহির চিৎকার দিয়ে বলল, 'না, আমি আর আলু খেতে চাই না। আপনি চুপ করুন।'

মাহির চিৎকার শুনে মা তড়াক করে জেগে মাহিরকে ডাকল, 'মাহির তুই কি স্বপ্ন দেখছিস? চিৎকার করছিস কেন?'

ঘুম ভেঙে গেল মাহির। 'ওহ্! এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম তাহলে। যাক বাবা, দুনিয়াটা আলুময় হয়ে যায়নি।'

মায়ের কথার উত্তর না দিয়ে মাহির একটু হাসল।

স্বপ্নের জন্য ঘুমটা ভালো হয়নি রাতে। ভোরের দিকে খুব ভালো ঘুমে ডুবে গেল মাহির। এই সময় মা মাহিরকে ডেকে বলল, 'মাহির, দেখ তোর ছোটো মামা এসেছে। এদিকে আয়।'

মাহির লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, 'কী মজা! কী মজা! ছোটো মামা এসেছে।' সে গেল ছোটো মামার কাছে। মামার কাছে গিয়ে বলল, 'মামা কী এনেছ আমার জন্য?'

মাহিরের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে ছোটো মামা বলল, 'দেখ, তোর জন্য এক বস্তা আলু এনেছি। তোর খুব প্রিয় তো তাই। এক মাস শুধু আলু খেয়েও শেষ করতে পারবি না।'

মামার কথা শুনে রাগে-দুঃখে মাহির চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। মা ও মামা দুজনেই তাকে ধরাধরি করে উঠাল।

হঠাৎ করে মাহিরের কী হলো কে জানে? ■

জিরাফের ছানা চিউ

সুমাইয়া বরকতউল্লাহ্

ধুপ করে পড়ল ছানাটা। কম করে হলেও এক মিটার তো হবেই। দৌড়ে এল সবাই। ছানা জিরাফের দিকে গলা বাড়িয়ে সুর করে গেয়ে উঠল, আমাদের পৃথিবীতে তোমাকে স্বাগতম।

ছানাটি একগাল হাসি দিয়ে বলল, অনেক ধন্যবাদ।

ভাবটা এমন যেন যেভাবেই হোক সবার আগে নিজের পায়ে তাকে দাঁড়াতেই হবে। সবাই যার যার কাজে চলে গেল। এদিকে ছানা তুমুল চেষ্টা করে যাচ্ছে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই সবাই দেখল তাদের নতুন পিচ্চি তিড়িংবিড়িং করে নাচছে।

কী আনন্দ তার!

ছানাটির মা এগিয়ে এসে বলল, অনেক নাচানাচি হয়েছে। এবার আয় তো, টাওয়ারস এ তোর পরিচয় করিয়ে দিই।

টাওয়ারস! টিং টিং করে হাঁটতে হাঁটতে ছানাটি মা কে বলল, টাওয়ারস কী মা?

আমরা পনেরোজন মিলে একেকটা দল করে থাকি। এ রকম দলকে টাওয়ারস বলে।

ছানার কি আর কৌতূহলের শেষ আছে! মায়ের সাথে বকবক করেই চলল। কত যে প্রশ্ন তার!

ছানা আর তার মা চলে এল টাওয়ারসে। মা জিরাফ বলল, আমার ছানা নিজের পরিচয় নিজেই দিবে...

সবাই খুশি হয়ে বলল, বলো বলো, আমরা তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

ছানাটি বড়োদের মতো করে বলতে শুরু করল, আমি এক জিরাফ ছানা। এক ঘণ্টা আগে ধুপুস করে পড়েছি উপর থেকে।

সবাই হি হি করে হেসে বলল, বেশ হয়েছে, বেশ করেছ। তবে তোমার তো একটা নাম লাগবে।

ছানাটি মুচকি হেসে বলল, আমি আমার নাম নিজেই ঠিক করেছি। কি নাম জানো?

না, জানতে চাই। বলো...

আমাকে তোমরা ডাকবে চিউ বলে।

সবাই গলা বাড়িয়ে বলল, এ আবার কেমন নাম! একটু বুঝিয়ে বলো তো।

মায়ের কাছ থেকে শুনেছি, শোনো। মানুষ আগে কী ভাবত জানো? আমরা বুঝি উট, চিতার চামড়া পড়ে ঘুরছি!

সবার হাসি দেখে কে! এক জিরাফ মজা করে বলল, কী আর করবে বলো! দুই পায়ে হাঁটে তো...

ছানাটা বলল, তাই আমি ঠিক করেছি, আমার নাম রাখব চিউ। চিতার চি আর উটের উ। কারণ মানুষ বোকা হলেও ভালো, মা বলেছে।

ছোট্ট এক জিরাফ বলে উঠল, কেমন করে ভালো? আমি তো মানুষদের খুব ভয় পাই। মা কত ভয়ের কিস্সা শোনায় তাদের নিয়ে। বাপরে!

চিউ ডানে বামে মাথা নেড়ে বলে, আমাদের সাহায্য করার জন্য মানুষরা একটা দিন রেখেছে, ২১শে জুন। ওই দিন ওরা সবাইকে বোঝায়, কীভাবে আমাদের ভালো রাখতে হবে। ওই দিনটাকে বলে *[বিশ্ব জিরাফ দিবস]*।

টাওয়ারস-এর একমাত্র প্রবীণ পুরুষ জিরাফ জিকো বললেন, বাহ্! চিউয়ের মা। তুমি তো ওকে এখনই অনেক কিছু শিখিয়ে ফেলেছ। খুব ভালো লাগল চিউ তোমার কথা। অনেক বড়ো হও।

বাকি সবাইও খুব প্রশংসা করল চিউয়ের কথার। মা জিরাফের মন খুশিতে ভরে উঠল।

চিউ কত কী যে ভাবে সারাদিন! হঠাৎ একদিন দেখে জিকোর সাথে বড়ো এক জিরাফ লম্বা গলা ডানে বামে হেলিয়ে-দুলিয়ে মারামারি করছে। চিউ দৌড়ে গেল মায়ের কাছে। মা, জিকো মারামারি করছে কার সাথে যেন। তাড়াতাড়ি আসো, থামাতে হবে তো।

ভয়ের কিছু নেই বাছা। অন্য দলের কেউ আমাদের দলে এসেছে ক্ষতি করতে। তাই জিকো তাকে বাধা দিচ্ছে। একে নেকিং বলে। জিকো খুব সাহসী। কিচ্ছুটি হতে দেবে না আমাদের। ঠিক আছে?

চিউ এখন শুধু মানুষ খুঁজে বেড়ায়। খুব শখ তার একটু গল্প করবে। খিদে পেলে গাছের পাতা খায়, দুই দিন পর পর পানি খায়। মাঝে মাঝে তার অসিকনস (Ossicone) দিয়ে গুঁতোগুঁতি করে। আর ক্লান্ত হয়ে গেলে কয়েক মিনিট ঘুমিয়ে নেয়। তারপর আবার মানুষ খুঁজে চলে, খেলবে যে!

চিউয়ের খেলার সাথি কে হতে চাও? আফ্রিকার ঘাসের বনে চলে যাও। দেখবে, চিউ দাঁড়িয়ে আছে তোমাকে স্বাগতম বলার জন্য! ■

নখের খোঁচা

অবনিল আহমেদ

মনে অনেক আনন্দ নিয়ে আজ ঘুম থেকে উঠল সাম্য। নবনিল জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া আজ তুমি এত খুশি কেন ?

সাম্য বলল, আজ তো শবেকদর। আর দুই দিন পরে ঈদ। তাই আজ শপিং-এ যাব।

নবনিল বলল, টাকা কোথায় পাবে?

সাম্য বলল, অনেক কষ্ট করে ৯ হাজার টাকা জমিয়েছি। আজ তাই অনেক শপিং করব। বন্ধুদের সাথে যাব। আমরা পাঁচজন, দীপ্ত, মুহিন, তামিম, আপন আর আমি।

সবাই সাম্যর বাসায় চলে এল। তারপর শপিং করতে বেরিয়ে গেল। একটু সামনে গিয়েই সাম্যর মনে হলো টাকা ভাংতি করা দরকার। তাই সাম্য যখনি ওর মানিব্যাগ বের করল, তখনই ও দেখল মানিব্যাগটি হালকা। তারপর যখনই ও মানিব্যাগটা খুলল, তখন ও দেখল মানিব্যাগটি ফাঁকা।

সাম্য ভাবল ও হয়ত টাকাটি বাসায় ফেলে এসেছে। আবার ফিরে এল বাড়িতে। কিন্তু টাকা পেল না। সাম্য প্রায় কেঁদে ফেলল। ওর টাকাটি চুরি হয়ে গেছে!

কিন্তু কে করেছে এ কাজ? ছোটো ভাই নবনিল সহ চার বন্ধুদের সার্চ করল সাম্য, কিন্তু কারোর কাছ থেকে পেল না। অন্যদিকে আপন কেন জানি হম্বিতম্বি করে চলে গেল। তাই সাম্যর আপনের উপর সন্দেহ হলো।

সাম্যর কাছে এখন শুধু একটাই সূত্র আছে এবং তাহলো মানিব্যাগ। বন্ধুরা সব বাসায় চলে গেছে। আর সাম্য বসে বসে মানিব্যাগ ঘাটা ঘাটি করছে। ঘাটা ঘাটি করতে গিয়ে সাম্য দেখল মানিব্যাগটার ডান দিকের উপরের অংশের সেলাই কেটে গেছে এবং চামড়ার মধ্যে একটি নখের আঁচড় বোঝা যাচ্ছে। সবাই জানে মুহিনের ডান হাতের কানি আঙুলের নখটা অনেক বড়ো আর ধারাল। আর যেহেতু একেবারে ডান দিকে সেহেতু এটা মুহিনের কাজ হবে। তাই সাম্য আর অপেক্ষা না করে মুহিনের বাসায় চলে গেল।

মুহিন সাম্যকে দেখেই অস্থির হয়ে উঠল। তখন সাম্য মুহিনকে বলল, আমি জানি টাকা কে চুরি করেছে।

মুহিন হতভম্ব হয়ে বলল, কে করেছে ?

তখনই সাম্য জোর গলায় বলল, তুমি করেছ। মুহিন বলল, না আমি করিনি। সাম্য যখন আবার বলল যে তুমি করেছ, তখন মুহিন হ্যাঁ বলেই চুপ হয়ে গেল। ওর মুখ ফস্কে সত্য কথা বের হয়ে গেছে।

মুহিন সাম্যকে বলল, বন্ধু আমি তোমার টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি দয়া করে কাউকে বলো না।

সাম্য রাজি হয়ে টাকা নিয়ে আসলো। তারপর থেকে মুহিন সবার থেকে দূরে দূরে থাকে। কারো সাথে খুব একটা মিশে না।

কিন্তু যাই হোক টাকাটা তো উদ্ধার হলো। এতেই সাম্যর শান্তি। না হলে ঈদটা যে সাম্যর কেমন করে কাটত কে জানে! ■

নবম শ্রেণি, রূপনগর সরকারি মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা।

গল্প

সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণ

ফারহান তৌহিদ

আমি একদিন সাইকেল চালাতে গিয়েছিলাম। সেইদিন আমি এত জোরে চালাচ্ছিলাম যে ব্রেক-ই লাগাতে পারছিলাম না। চলতে চলতে প্রথমে ঢাকা গেলাম এরপর ইন্ডিয়া হয়ে এশিয়ার সব দেশে চলে গেলাম। এভাবে সারাবিশ্ব ঘোরার পর সৌরজগতে চলে গেলাম। প্রথমে আমি চাঁদের সাথে ধাক্কা খেলাম, এভাবে সব গ্রহের সাথে ধাক্কা খেয়ে সূর্যের আগুনে পুড়ে ছাই হলাম। তারপর চাঁদে গিয়ে ঠান্ডা হয়ে আবার বেঁচে উঠি। এরপর গেলাম এক পচা দেশে। তার নাম পাকিস্তান। সেখানে ছোটো মিলিটারিরা আমাকে মারার জন্য আসলে, আমি তাদের রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকেই শেষ করে দেই। কিছু সময় পর আমি সাইকেল নিয়ে ওদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়ি এবং কমান্ডারকে শেষ করে ওদের ক্যাম্প উড়িয়ে দেই। এরপর তাদেরকে গরুর গবরের নিচে কবর দেই।

ফেরার পথে যখন সাইকেল নিতে যাই তখনি একটি ভুল করি।

পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খেয়ে কোথায় যেন পড়লাম? হ্যাঁ, চাঁদে। তখন বাংলাদেশে রাত ছিল। আমি ফ্রিজ থেকে মিষ্টি চুরি করে খাচ্ছি। আমি যখন খাচ্ছিলাম তখন রকেটে একজনকে বিরিয়ানি খেতে দেখলাম। সে আমার ভাই জুনায়েদ। তার সাইকেল আমার চেয়ে বড়ো। তখন আমি সৌরজগতে কাপড় ও অন্য একটি রকেট দেখলাম। আমি সেগুলো পরে নিলাম। আমি তখন সাইকেল নিয়ে রকেটে উঠে পড়ি এবং দেখি আমার ভাইয়ের পাশে আমার দুষ্টু বন্ধু আবদুল্লা আরেকটা রকেট চালাচ্ছে। তখন আমি বোমা মেরে ওর রকেট ব্লাস্ট করি। তারপর আমার রকেট ও ভাইয়ার রকেট থেমে গেল। রকেট থামার পর আমার বন্ধুর ছোটো ভাই আহমদুল্লা ছোটো রকেট নিয়ে আমাদেরকে মারার জন্য আসলো। আমরা তখন ওর রকেটে ঢুকে পড়ে রকেট ব্লাস্ট করলে আহমদুল্লা রকেট থেকে সূর্যের ভিতর পড়ল। সেখান থেকে চাঁদে গিয়ে ঠান্ডা হয়ে পৃথিবীতে গরুর গোবরে গিয়ে পড়ে।

এদিকে আমরা যখন রকেট নিয়ে সামনে গেলাম, তখন এলিয়েনদের রকেট দেখলাম। এলিয়েনরা বলে, আমরা চালাক আছি। তখন আমার ভাইয়া বলল, আমি নবারুণের কবি-

ওগো মোর এলিয়েন মণি
তোমাদের নেই কোনো
গুণ বুঝি, তবে চালাক ছাড়
এরা কিছু পারে না।

এই কথা শুনে এলিয়েনরা লঞ্চার মারে। তারপর আমরা চাঁদ থেকে পৃথিবীর বাংলাদেশে আমাদের বাসায় পড়লাম।

যেই চোখ খুললাম, দেখি
আমি বিছানায়
এবং আমার পাশে ভাইয়াও!!! ■

শিশু শ্রেণি, বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।

পৃথিবীর মানুষের তৈরি নয়, ভিনগ্রহীদের তৈরি করা বলে দাবি করা আরো কিছু রহস্যময় স্থাপনার কথা জানাব এবার।

রহস্যময় স্থাপত্য

খালিদ বিন আনিস

গোসেক চক্র

জার্মানির গোসেক শহরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন এই স্থাপনা সময়ের নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা নিয়ে টিকে থাকলেও এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আর্কষণ হয় ১৯৯১ সালে। পরীক্ষা করে দেখা যায়, যুক্তরাজ্যের উইল্টশায়ারের স্টোনহেঞ্জের মতো এই স্থাপনাটিও যিশুর জন্মের প্রায় ৪ হাজার ৯শ' বছর আগের তৈরি। এত প্রাচীন স্থাপনাটি কারা নির্মাণ করেছিল? এই বিষয়ে অন্ধকারে থাকা বিজ্ঞানীদের ধারণা, সম্ভবত ইউরোপে যারা প্রথম বসতি গড়ে তারাই ধর্মীয় আচার পালনে এমন অদ্ভুত স্থাপনাটি নির্মাণ করেছিল। কেউ কেউ বলছেন, সম্ভবত ঘড়ি আর ক্যালেন্ডার হিসেবে ব্যবহার হতো স্থাপনাটি। কারোর মতে, সম্ভবত মহাকাশ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে এটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। স্টোনহেঞ্জের মতো এই প্রাচীন স্থাপনাও কেন প্রাচীন সভ্যতার মানুষ ব্যবহার করত তা আজও রহস্যই থেকে গেছে।

গোবেকলি টেপে

মেসোপটেমিয়ার আদি শহরগুলোর চেয়ে ৫ হাজার বছর পুরনো, ইংল্যান্ডের স্টোনহেঞ্জের চেয়ে ৭ হাজার বছর পুরনো, মিশরের পিরামিডের চেয়ে ৭ হাজার বছর পুরানো যে স্থাপত্যকে ঘিরে এখনো রহস্য রয়ে গেছে সেটি গোবেকলি টেপে। গবেষকদের মতে, এটি সম্ভবত মানুষের তৈরি প্রথম কোনো স্থাপত্য।

সিরিয়া সীমান্তবর্তী তুরস্কের দক্ষিণে অবস্থিত এই স্থাপত্য নিখুঁতভাবে পাহাড় কেটে তৈরি করা। এই স্থাপত্যও উপাসনার কাজে ব্যবহৃত হতো বলে গবেষকদের ধারণা। কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষ এত নিখুঁত করে কীভাবে স্থাপত্যটি নির্মাণ করেছিল তা যেমন রহস্য, তারচেয়ে বড়ো রহস্য হচ্ছে এটি আসলে কী কাজে ব্যবহার করা হতো।

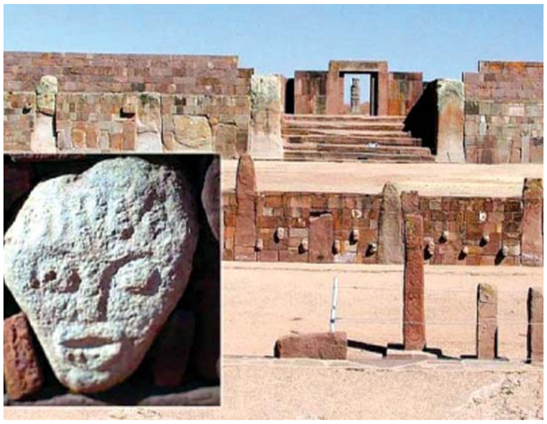

পুমা পাঙ্কু

বলিভিয়ার টিউয়ানাকু এলাকায় অবস্থিত প্রাচীন এই স্থাপনাটি সম্পর্কে এলিয়েন বিশ্বাসীরা সবচেয়ে বেশি কথা বলে থাকে। এর নির্মাণশৈলী ও কৌশল নিয়ে হালের বিজ্ঞানীরা এখনো রহস্যে। তারচেয়ে বড়ো রহস্য হচ্ছে এই স্থাপত্যটি কি কাজে ব্যবহার করা হতো। অন্যান্য প্রাচীন স্থাপত্যের মতো এটি নিয়েও গবেষকদের দাবি হচ্ছে, তিউয়ানাকু সম্রাটদের শাসনামলে তৈরি এই স্থাপনা উপাসনার কাজেই ব্যবহার হতো।

উঁচু টিলার ওপরে স্থাপিত পাথরের তৈরি এই স্থাপনাটি ৩০০ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি কোনো একসময় নির্মাণ করা হয় বলে গবেষকদের ধারণা। এর নির্মাণ কৌশল এতই সুনিপুণ যে আজকের স্থাপত্যবিদেরাও অবাক হয়ে যান। তারা স্বীকারও করেছেন, এই পাথরগুলো দিয়ে স্থাপনাটি আবার তৈরি করা তাদের পক্ষেও সম্ভব নয়।

গবেষকদের ধারণা, অত্যন্ত নিখুঁত এই স্থাপনাটি কোনোভাবেই তিউয়ানাকু সভ্যতার লোকেরা তৈরি করেনি। সাগর পাড়ি দিয়ে আসা কোনো জাতি হয়ত স্থাপনাটি তৈরি করে দিয়ে গেছে। তবে এলিয়েন গবেষকদের দাবি, এমন স্থাপত্যের পেছনে রয়েছে ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান মানুষ। ■

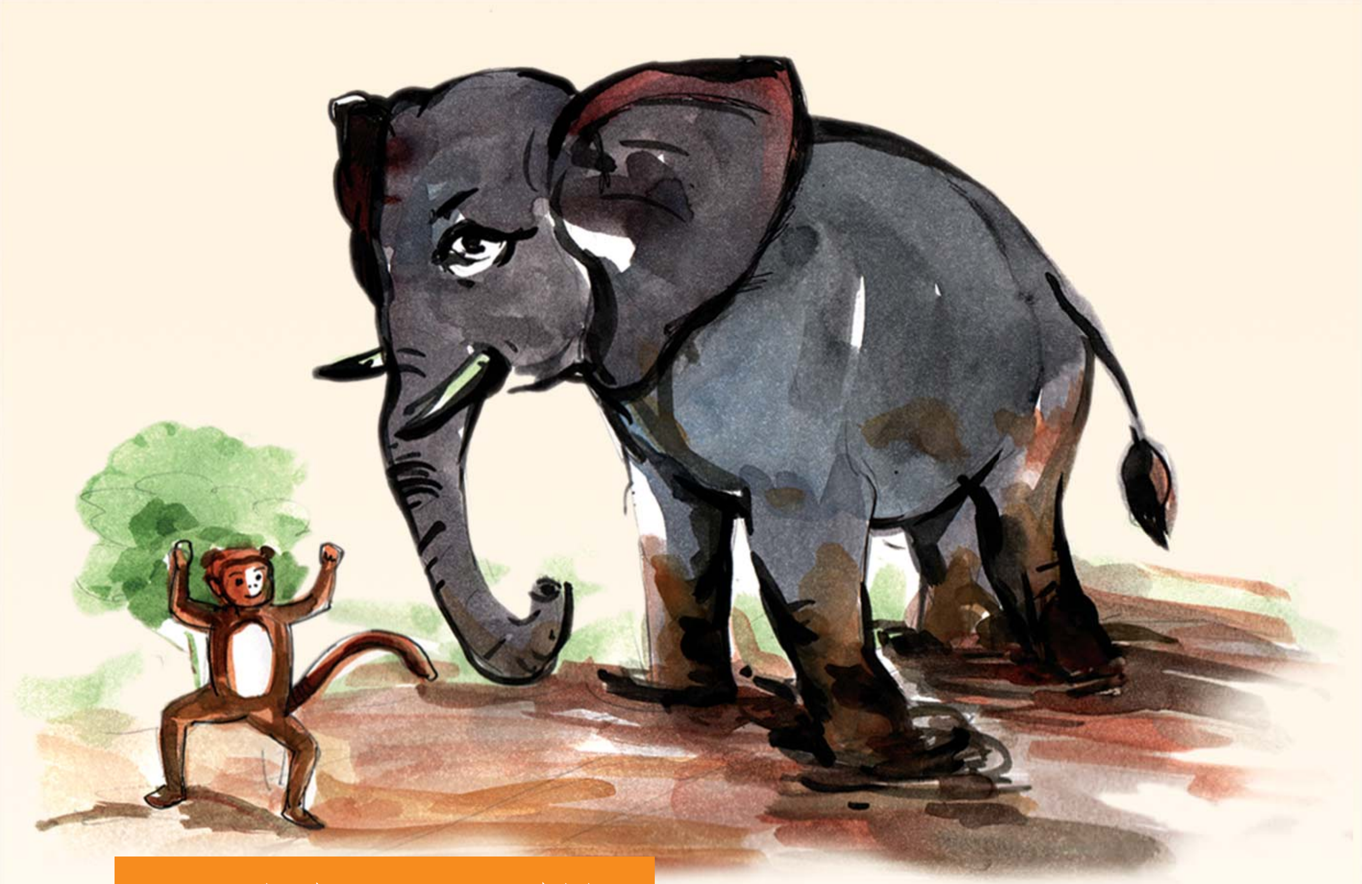

নতুন পড়ুয়াদের জন্য সহজ গপ্‌প

হাতির বিপদ

রকিবুল ইসলাম

গভীর বন। সেই বনে বাস করে মস্ত এক হাতি। হাতিটা যেমনি বড়ো, তেমনি তার শক্তি। এজন্য সে নিজেকে নিয়ে অহংকার করে। একদিন সকালে হাতিটা হাঁটতে বের হলো। সকালের নির্মল বাতাস ওর খুব প্রিয়। হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল। পাশেই ছিল নরম কাদার একটা গর্ত। সে খেয়াল করল না। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল কাদায়। কাদা এতই নরম ছিল যে, হাতি উঠতে পারল না।

পাশের বড়ো গাছটাতে একটা বানর খেলা করছিল। হাতির ছটফট করা সে দেখতে পেল। বানর এগিয়ে গেল হাতির কাছে। বলল, কী হয়েছে হাতিরাজ?

হাতি বলল, আমি উঠতে পারছি না। আমাকে এখান থেকে তোলার ব্যবস্থা করো।

বানর বলল, তোমার তো অনেক শক্তি! উঠে পড়ো?

হাতি বলল, শক্তি দিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে না। বুদ্ধি বের করতে হবে।

বানর দৌড়ে বনের ভেতরে চলে গেল। কে কোথায় আছ? তাড়াতাড়ি এসো, হাতিরাজ কাদায় পড়েছে।

বাঘ, শিয়াল, হরিণ, বেজিসহ সবাই ছুটে এল। গর্তের চারিদিকে জড়ো হলো অনেক পশুপাখি। প্রাণের ভয় না করে সবাই গেল হাতিকে উদ্ধার করতে। কিন্তু কোনোভাবেই হাতিকে নড়ানো যাচ্ছিল না। এত বড়ো হাতিকে নড়ানো কি যেই সেই ব্যাপার!

হাতি কোনোভাবেই তার শক্তি ব্যবহার করতে পারছে না।

সবাই ব্যর্থ হয়ে বসে পড়ল। এদিকে হাতি তো ভয়ে চুপসে গেল। গর্তের পাড়ে বসে সবাই ভাবতে লাগল, কী করা যায়!

এমন সময় একটা পিঁপড়া এল। বলল, আমি পারব হাতিকে কাদা থেকে তুলতে।

সবাই শুনে তো অবাক। পুচকে একটা পিঁপড়া বলে কী! এতগুলো পশু একসাথে লেগেও পারল না। আর পিঁপড়া নাকি...

সবাই হো হো করে হাসতে লাগল।

হাতি বলল, পিঁপড়া ভাই, যেভাবেই হোক তুমি আমাকে উদ্ধার করো। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সবাই তাকিয়ে থাকল পিঁপড়ার দিকে। পিঁপড়া বলল, বানর ভাই আমাকে একটু হাতিরাজের কানের কাছে রেখে আসো।

বানর তাই করল। পিঁপড়াকে নিয়ে হাতির কানের কাছে দিয়ে এল। পিঁপড়াটা আস্তে আস্তে হাতিটার কানের ভেতর ঢুকে গেল। ভেতরে গিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। হাতি অমনি লাফিয়ে উঠল। আর উঠেই এক লাফে পাড়ে চলে আসলো।

সবাই তো এবার অবাক হয়ে গেল! বাহ, ছোট্ট একটা পিঁপড়ার এত বুদ্ধি! হাতির কান থেকে পিঁপড়াটা বেরিয়ে এল।

হাতি বলল, পিঁপড়া ভাই তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি আর নিজেকে বড়ো ভাবব না। নিজেকে বড়ো ভেবে ভুল করেছি। অহংকার করা ঠিক না। বুদ্ধি থাকলে ছোটোরাও অনেক বড়ো কাজ করতে পারে। আসলে, আমরা সবাই সমান।

হাতি পিঁপড়াকে কাঁধে তুলে নিলো। আর সবাই চলল হাতির পিছে পিছে। ■

টার্কি মুরগির ডিম

শেকস্‌পীয়র কায়সার

হাট্টিমা টিম টিম
টার্কি মুরগির ডিম
খাঁচায় পাড়ে, মাচায় পাড়ে
বড়ো বড়ো ডিম।
ঘোড়ার নেই ডিম
খাঁচায় আছে ফোঁটা দেয়া
কোয়েল পাখির ডিম
হাট্টি মা টিম টিম
টার্কি মুরগির ডিম
অত বড়ো ডিম দেখে
মাথায় গজায় শিং।

সপ্তম শ্রেণি, আনন্দ মাল্টি মিডিয়া স্কুল সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

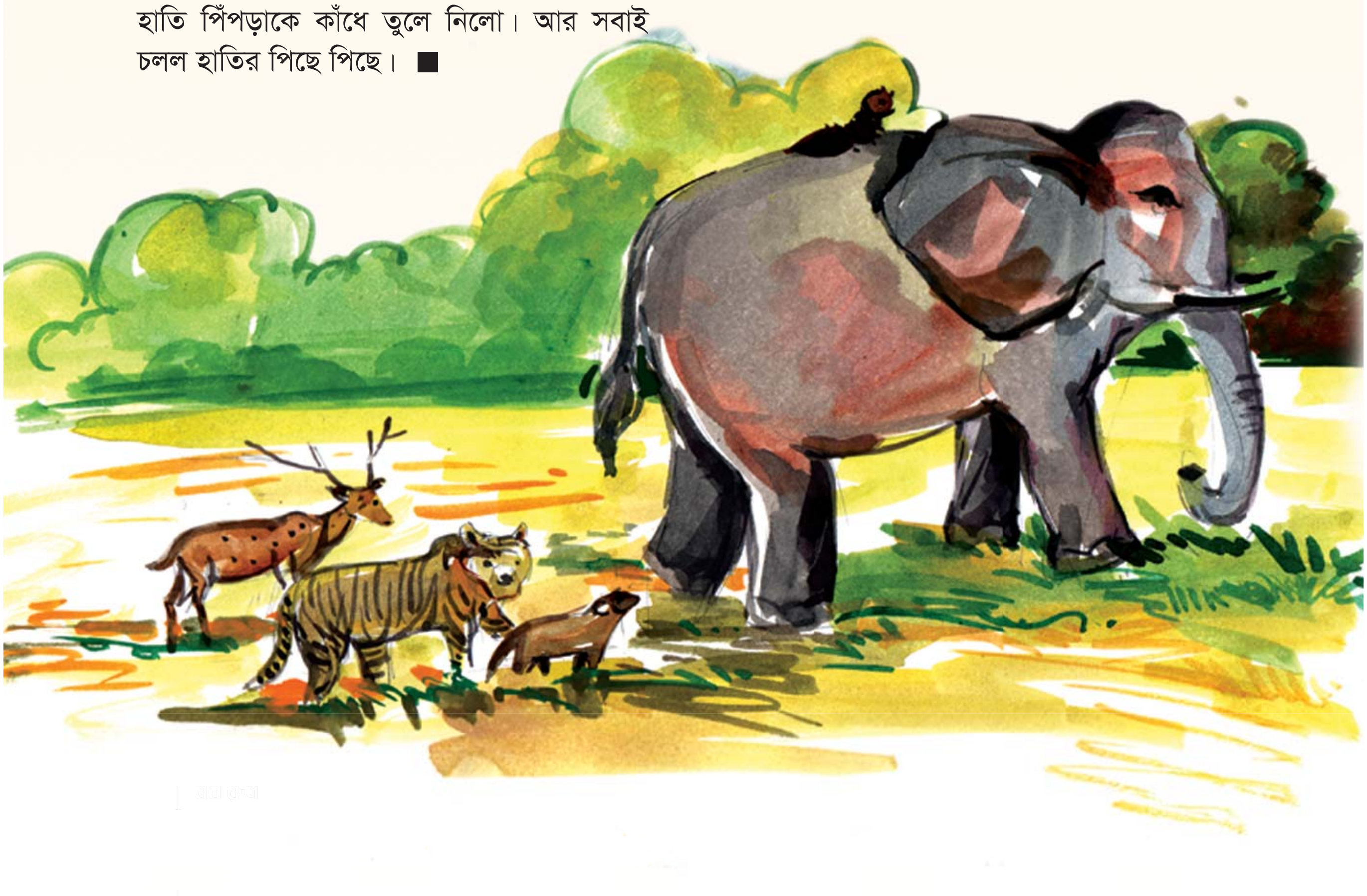

বোকা রাজার কাণ্ড

ইসহাক খান

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার ছিল হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া। প্রজাদের কোনো অভাব নেই। কিন্তু তারপরও প্রজারা সুখী না। কারণ রাজা ছিলেন বোকা এবং রাগী স্বভাবের। তার যখন যা খেয়াল হতো তাই করতেন। তার খাম-খেয়ালির কারণে অনেকসময় প্রজারা কষ্ট পেত। অনেকে ভাবতো রাজার মাথায় গণ্ডগোল আছে!

একবার দেখা গেল দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে জলাবদ্ধতা হয়েছে। সাগর থেকে জোয়ারের পানি এসে সেই পানি না বেরুতে পেরে জমির ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। কৃষকদের মাথায় হাত। এই খবর রাজার কানে এলে রাজা হুকুম দিলেন, এক্ষুণি জলাবদ্ধতার জায়গা থেকে খাল কেটে সাগর পর্যন্ত খাল নিয়ে যাওয়া হোক। তাহলে পানি সহজে বের হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু জোয়ারের সময় সাগর থেকে আবার লোনা পানি এসে নিচু জায়গায় ঢুকে পড়বে, এই বিষয়টি তাকে কিছুতেই বোঝানো গেল না। রাজ্যের বাঘা বাঘা পরিবেশবিদ তাকে বোঝালেন, মহারাজ, খাল যদি সাগরের দিকে নেওয়া হয় তাহলে জোয়ারের সময় ওই খাল দিয়ে আবার সাগরের লোনা পানি ঢুকে ফসলের ক্ষতি করবে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আগে গবেষণা করা দরকার।

রাজা ক্ষেপে গেলেন। রাগ মুখে বললেন, রাখো তোমাদের গবেষণা। তোমাদের এই গবেষণার কথা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে। তোমাদের গবেষণার ফল পেতে দেরি হবে। ততদিনে আমার প্রজারা মরে ভূত হয়ে যাবে।

মহারাজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ডেকে বললেন, আজই সৈন্য পাঠিয়ে খাল কাটার কাজ ব্যবস্থা করুন।

মহারাজের হুকুম মতো খাল কাটার কাজ শুরু করে সৈন্যরা। দিনরাত কাজ করে দিনকয়েকের মধ্যে সৈন্যরা খাল কাটার কাজ শেষ করে ফেলল।

খাল কাটার কয়েক ঘন্টার মধ্যে আবার জোয়ারের পানি ঢুকে পড়ল। কারণ ছয় ঘন্টা অন্তর অন্তর সাগরে জোয়ার-ভাটা হয়। এই সমস্যাটা রাজাকে বুঝিয়েও কাজ হয়নি। তিনি আসলে অন্যের পরামর্শ কানে তোলেন না।

কিছুদিন পর নতুন আরো একটি সমস্যা দেখা দিলো রাজ্যে। কৃষকরা সারের জন্য ধর্মঘট করেছে। এই কথা শোনা মাত্র মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে সৈন্যদের গুলি করার আদেশ দিলেন। বোকা মানুষের নাকি রাগ বেশি থাকে। কারণ তারা চিন্তা করে কিছু করে না। যা করে তা করে ঝোঁকের মাথায়। সেই কাজে বাধা আসলেই তারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

মহারাজ আবার তার রানিকে খুব হিসেব করে চলেন। রানি রাজার এই অন্যায় আদেশ শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ দাসীর মাধ্যমে রাজাকে অন্দরমহলে ডেকে পাঠান। বলেন, সার কৃষকের নিত্য প্রয়োজন। সার ছাড়া তারা জমিতে ফসল ফলাবে কীভাবে?

মহারাজ আমতা আমতা করে বললেন, ব্যাপারটাতো আমি এইভাবে ভাবিনি রানি।

তার আগে বলেন, আপনাকে এই পরামর্শ কে দিয়েছে?'

রাজা পড়লেন বেকায়দায়। কারণ তাকে এই পরামর্শ কেউ দেয়নি। তিনি নিজেই এই আদেশ জারি করেছেন। রাজা মিন মিন করে বললেন, সেটা পরে শুনো। এখন তাড়াতাড়ি বলো, কি করা যায়?

সেনাপতিকে ডেকে এখনই সৈন্যদের গুলি না করতে বলে দেন। আর দ্রুত সারের ব্যবস্থা করেন। রানি সোজাসাপটা বলে দিলেন।

কৃষকরা জানতে পারল মহারাজ সারের ব্যবস্থা করছেন। তারা উৎফুল্ল হয়ে মহারাজের জয়গান গেয়ে উল্লাস করতে লাগল। রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এল। দরবারে পারিষদবর্গ মহারাজের প্রশংসা করে জয়ধ্বনি করতে লাগল।

এইসময় খবর এল, রাজকন্যার কূপের পানিতে ভীষণ দুর্গন্ধ। রাজকন্যা সেই পানিতে গোসল করতে পারছে না। রাজকন্যার মন খারাপ। সে মিনাবাজারে যাবে। কিন্তু গোসল ছাড়া সাজগোজ না করে সে মিনাবাজারে কীভাবে যাবে?

এই খবরে মহারাজ ভীষণ অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। রাজকন্যাকে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। তার প্রিয় কন্যার জন্য তিনি সব করতে পারেন।

খবরটি শোনামাত্র তিনি ছুটে এলেন অন্দরমহলে। এসে দেখলেন, রাজকন্যা মন খারাপ করে বসে আছে। তাই দেখে মহারাজের মন অস্থির হয়ে ওঠে। তিনি সোজা আবার রাজদরবারে এসে বিষয়টি জরুরি সমাধানের জন্য মন্ত্রিপরিষদকে নির্দেশ দিলেন। নানাজন নানা পরামর্শ দিল। অর্থমন্ত্রী বললেন, মাটির নিচে জোয়ারের পানি দূষিত হয়ে গেছে। স্থান পরিবর্তন করে নতুন কূপ খনন করলে ভালো হয়।

মহারাজ ব্যঙ্গ করে বললেন, আগে আপনার মাথা খুঁড়তে পারলে বেশি ভালো হয়।

পরিবেশমন্ত্রী বললেন, এই নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তারা কূপের পানি নিয়ে গবেষণা করে আমাদের জানাবে। আমরা সেই মতো সিদ্ধান্ত নেব।

মহারাজ রাগত স্বরে বললেন, 'আপনাকে এখনই জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞ কমিটি করবেন, আমার কন্যা ততদিন গোসল ছাড়াই থাকবে?'

বাণিজ্যমন্ত্রী বললেন, উজানে কোনো জাহাজ ডুবি হয়েছে কিনা। যে কারণে সেই জাহাজের বর্জ্য মাটির নিচে জোয়ারের পানিতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

মহারাজ রেগে বললেন, আপনাকে এখনই ভেলায় করে বাণিজ্যে পাঠানো উচিত।

মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ কোনোটাই মহারাজের মনঃপূত হলো না। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, এক্ষুনি কূপের সব পানি তুলে ফেলা হোক।

মহারাজের নির্দেশে সৈন্যরা মুহূর্তে কূপের সমস্ত পানি বালতিতে দড়ি বেঁধে তুলে ফেলল। সেই পানিতে ভয়ংকর দুর্গন্ধ। রানি দূর থেকে সৈনিকদের এসব কর্মকাণ্ড দেখছিলেন। কিন্তু কাছে এসে কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না।

জোয়ারের পানিতে আবার কূপ আগের অবস্থায় ফিরে এলে সবাই ভীষণ উৎসাহে বালতি নামিয়ে পানি তুলে শুঁকে দেখল পানি আগের মতোই দুর্গন্ধ। মহারাজের হুকুমে কূপের পানি আবার তুলে ফেলা হলো। কিছুক্ষণ পর আবার জোয়ারের পানিতে কূপ ভরে গেল। তবু আগের মতোই পানিতে দুর্গন্ধ। মহারাজ এবার ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি রানির সঙ্গে পরামর্শ করতে অন্দরমহলে গেলেন। বললেন, রানি আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন কি করা যায়, তুমি একটা পরামর্শ দাও।

রানি বললেন, আপনি রাজ্যময় ঘোষণা দিয়ে দেন যে, এই কূপের পানির দুর্গন্ধের কারণ অনুসন্ধান করে দিতে পারবে তাকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

মহারাজের নির্দেশে রাজ্যময় ঢ্যাড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হলো, যে কূপের পানির দুর্গন্ধের কারণ অনুসন্ধান করে দিতে পারবে তাকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই ঘোষণায় রাজ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। অনেক মানুষ ছুটে এল। তাদের জন্য মহলের বাইরে ছোটোখাটো তাঁবু টানিয়ে দেওয়া হলো। এবং তাদের অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের জন্য একজন পরিবেশ বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে একটি ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন

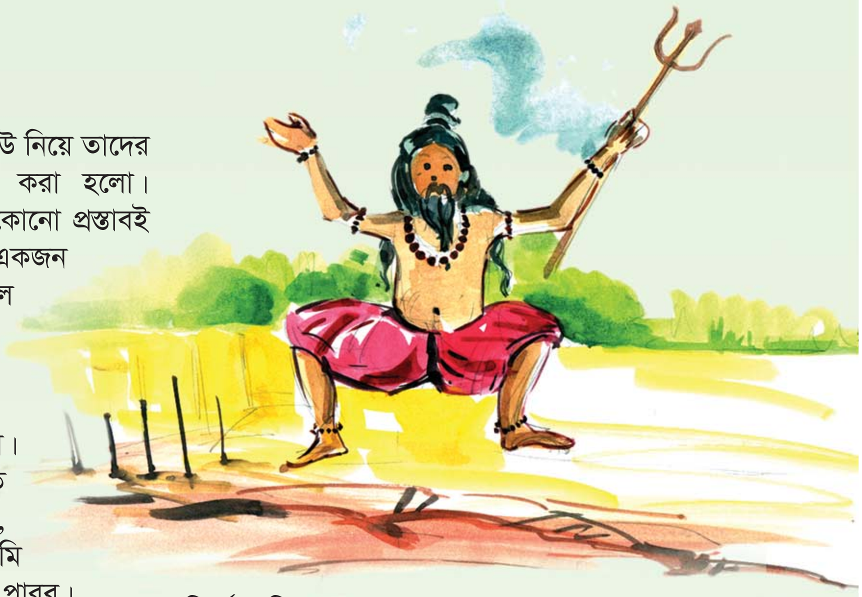

করা হলো। আগত ব্যক্তিদের ইন্টারভিউ নিয়ে তাদের কর্মপদ্ধতি যাচাই-বাছাইয়ের ব্যবস্থা করা হলো। নানাজন নানা প্রস্তাব দিতে লাগল। কোনো প্রস্তাবই বোর্ডের পছন্দ হচ্ছিল না। এর মধ্যে একজন তান্ত্রিক এসে 'ভোম ভোলানাথ' বলে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে হাজির হলো। জটাধারি, পরনে লাল শালু। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তার একহাতে লোহার চিমটে। অন্য হাতে ধূপদানি। সেখান থেকে ধুঁয়ো উড়ছে। তাতে ধূপের গন্ধ ম ম করছে। সাধু বললেন, আমি তান্ত্রিক। মন্ত্রের সাহায্যে আমি কূপের জলের দুর্গন্ধের কারণ ধরতে পারব। আর কারণ ধরতে পারলেই সমাধানও করতে পারব।

তান্ত্রিকের কথা মহারাজের ভীষণ পছন্দ হলো। তাকে নিয়ে যাওয়া হলো কূপের কাছে। পাকা কূপটির চারপাশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলেন তান্ত্রিক সাধু। তারপর মন্ত্র পড়ে কূপের ভেতর ধূপের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলেন। আর বললেন, সবাই যেন নিশ্বাস বন্ধ করে রাখে। মহারাজাও নিশ্বাস বন্ধ করে অনেক আগ্রহ নিয়ে তান্ত্রিক সাধুর কার্যকলাপ দেখছিলেন। তান্ত্রিক সাধু একসময় মন্ত্র পাঠ করতে করতে কূপের চারপাশে ঘিরে দৌড়াতে লাগলেন। দৌড়াতে দৌড়াতে তান্ত্রিক সাধু ঘেমে নেয়ে উঠলেন। তবু তার দৌড় বন্ধ হলো না। দৌড়াতে দৌড়াতে তান্ত্রিক সাধু মহলের বাইরে চলে গেলেন।

তামাশা দেখার জন্য কৌতূহলী জনতা তার পিছু পিছু ছুটল। তান্ত্রিক ছুটছেতো ছুটছেই। সে আর থামছে না। জনতাও থামছে না। তারাও পিছে পিছে ছুটছে।

তান্ত্রিক সাধু ছুটতে ছুটতে নদীর পাড়ে এসে থামলেন। ক্লান্ত হয়ে গেছেন। হাঁপাতে লাগলেন। পেছনে তাকিয়ে দেখলেন জনতা তার পিছু পিছু আসছে। বিপদ বুঝে তান্ত্রিক সাধু সাঁতরে নদী পার হয়ে গেলেন। জনতা এবার ফিরে এল। তারা মহারাজকে জানাল তান্ত্রিক সাধু সাঁতরে নদী পার হয়ে গেছে।

রানি বললেন, আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। ও একটা ভণ্ড সাধু। বিপদ আঁচ করতে পেরে এই কায়দায় পালিয়ে গেছে।

মহারাজা রাজকন্যার ভবনের পাশে নতুন কূপ খননের নির্দেশ দিলেন।

সৈন্যরা আদেশ পেয়ে আর দেরি করল না। কূপ খনন করে ফেলল। কিন্তু নতুন কূপে দেখা দিল ভিন্ন সমস্যা। নতুন কূপের পানি লালচে। খাওয়া যায় না। বিস্বাদ লাগে। আঠা আঠা। চুলে জট পাকিয়ে যায়।

মহারাজ এবং তার পরিষদবর্গ মহা ঝামেলায় পড়ে গেলেন। এই সমস্যার সমাধান কি? আবার রাজ্যময় ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দেওয়া হলো। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য তেমন কেউ এগিয়ে এল না। মহারাজ অধৈর্য হয়ে পড়লেন। রাজকন্যার মুখে হাসি নেই। তাই দেখে মহারাজের মুখে হাসি থেমে গেছে।

এই সময় একজন ব্যক্তি এসে মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বয়স চল্লিশ-পয়তাল্লিশ। চেহারা ভাঙাচোরা। চোখ কোটরে বসা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চুল উশকোখুশকো।

মহারাজ হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'কি করো তুমি? কেন এসেছ এখানে?'

লোকটি ঢোক গিলে বলল, আজ্ঞে মহারাজ! অধীনের পেশা কূপ খনন। এই করেই আমি জীবিকা নির্বাহ করি। আমি অনেকদিন হলো বেকার। শহরের মানুষগুলো আর কূপ খনন করে না। তারা চাপকল মেশিন কিনে পানি তুলে ব্যবহার করে।

সেটা কি রকম?

লোকটি বলল, মেশিনের পাইপ মাটির নিচে দিয়ে উপরের হ্যান্ডেলে চাপ দিলে পানি চলে আসে।

মহারাজ অতি উৎসাহে লোকটিকে বললেন, আমার

মেয়ের জন্য তুমি সেই মেশিন কিনে দাও।

এই সুখবরটা মহারাজ দ্রুত অন্দরমহলে পাঠিয়ে দিলেন। এবং বেশ পুলক অনুভব করতে লাগলেন। রাজকন্যা দরবারে এসে বলল, মহারাজ। চাপকল আমি ব্যবহার করব না। চাপকলের পানিতে আর্সেনিক থাকে।

আর্সেনিক কিরে মা?

রাজকন্যা বলল, 'আর্সেনিক মারাত্মক দূষিত জিনিস মহারাজ। শরীরে অনেক অসুখবিসুখ সৃষ্টি করে। ত্বকে ঘা হয়ে যায়।

লোকটি আমতা আমতা করে বলল, সব চাপকলে না মহারাজ। কিছু কিছু চাপকলের পানিতে আর্সেনিক ধরা পড়েছে।

রাজকন্যা অনেক পড়াশোনা করে। তার অনেক জ্ঞান। এই জন্যে মহারাজ তাকে ভীষণ ভালোবাসেন। তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, রাজকন্যা যেখানে আপত্তি করেছে সেখানে আর কোনো কথা চলবে না। তুমি এবার যেতে পারো।

লোকটি বিনীতভাবে বলল, মহারাজ, যাওয়ার আগে আমি একবার কূপটি দেখতে পারি?

তার আগে বলো, আমি একটি নতুন কূপ খনন করেছি। কিন্তু সেই কূপের পানি লালচে রঙের। এর কারণ কি?

লোকটি বলল, ওই কূপের পানিতে আয়রন বেশি। এই কারণে পানি লালচে। ওই পানি পান করলে পেটের পীড়া হবে মহারাজ।

আয়রন কি?

রাজকন্যা অন্দরমহলে চলে যাচ্ছিল। মহারাজের হুংকারে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, মহারাজ, আয়রন মানে লোহা। পানিতে লৌহের মিশ্রণ থাকে। লৌহের পরিমাণ বেশি থাকলে সেই পানি ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়।

বলেই রাজকন্যা ভেতরে চলে গেল।

মহারাজ দেখলেন লোকটি চেহারা সুরত বিধ্বস্ত হলেও সে সব প্রশ্নের যথার্থ জবাব দিয়েছে। তাকে দুর্গন্ধ কূপের কাছে নেওয়া হলো। মহারাজা বললেন, তুমি কূপের পানির দুর্গন্ধ দূর করতে পারলে পুরস্কার পাবে। আর না পারলে তোমাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

লোকটি কূপের কাছে গিয়ে গভীরভাবে কূপের ভেতর তাকিয়ে দেখতে লাগল। সব দেখে মহারাজের কাছে গিয়ে বিনয় প্রকাশ করে বলল, আমি পারব মহারাজ। তবে, আমি যে-সব জিনিস চাইব তা সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে। কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।

লোকটি বলল, কূপের সব পানি তুলে ফেলা হোক।

মহারাজের হুকুমে সৈন্যরা কিছুক্ষণের মধ্যে কূপের সব পানি তুলে ফেলল। তারপর লোকটি বলল, মোটা দেখে লম্বা রশি আনা হোক।

লোকটির কথামতো মোটা লম্বা রশি আনা হলো। রশির এক মাথা নিজের কোমরে বেঁধে লোকটি রশির অন্য মাথা কয়েকজন সৈন্যকে শক্ত করে ধরতে বলল। এবং সেই সঙ্গে বলল, আমি রশি টান দিলে তোমরা আমাকে টেনে উপরে তুলবে।

তারপর লোকটি কূপের মধ্যে নেমে গেল। সবাই কূপের চারপাশ ঘিরে ঘাড় নামিয়ে লোকটিকে দেখছে। একটু পর রশির টানে সৈন্যরা রশি ধরে টেনে তুলতে থাকে। লোকটি উপরে উঠে এলে সবাই ঘটনা জানতে ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। লোকটি কারো কোনো কথার জবাব না দিয়ে বলল, একটি বালতি দেওয়া হোক।

বালতি নিয়ে লোকটি আবার কূপে নেমে গেল। একটু পর আবার রশিতে টান। সৈন্যরা তাকে টেনে তুলল। দেখা গেল বালতিতে কি একটা জিনিস। দুর্গন্ধে তার কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। লোকটি মহলের বাইরে গিয়ে জিনিসটা মাটির নিচে পুঁতে রাখল। তারপর ফিরে এসে মহারাজকে বলল, মহারাজ, আমার কাজ প্রায় শেষের দিকে। বাজার থেকে ব্লিচিং পাউডার আনার ব্যবস্থা করুন।

এর মধ্যে যেটুকু পানি কূপে জমেছিল সবটুকু পানি তুলে ফেলতে বলল লোকটি। আবার পানি জমল, আবার তুলে ফেলল। এভাবে বার তিনেক কূপ থেকে পানি তুলে তারপর লোকটি কোমরে রশি বেঁধে আবার কূপের ভেতরে নেমে গেল। গিয়ে সে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিয়ে রশিতে টান দিলে তাকে সৈন্যরা টেনে তুলল।

তারপর সে মহারাজের কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলল। কূপে বিড়াল ছানা পড়ে পচে পানি দুর্গন্ধ হয়েছিল। শুধু পানি তোলায় কোনো লাভ হয়নি। আসল জিনিস না তোলায় পানির দুর্গন্ধ যায়নি। আমি

সেই আসল কাজটি করেছি। মৃত বিড়াল ছানাকে তুলে ফেলেছি। তাতে পানি থেকে দুর্গন্ধ চলে গেছে। আশা করি এখন পানিতে আর দুর্গন্ধ থাকবে না।

মহারাজ লোকটির কথা প্রমাণের জন্য সৈন্যদের কূপ থেকে পানি তুলে সেই পানি লোকটিকে পান করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি পানি পান করল। অন্যরাও সেই পানি পান করল এবং আনন্দের সঙ্গে বলল, পানিতে কোনো দুর্গন্ধ নেই।

লোকটির মুখে এবার হাসি দেখা গেল। মহারাজকে পানপাত্রে পানি দেওয়া হলো। নাকের কাছে পানি নিয়ে শুঁকে ভয়ে ভয়ে পান করলেন। মহারাজ যেহেতু পান করেছেন তখন অন্য মন্ত্রীরা পান না করে থাকেন কীভাবে? তারাও পান করলেন। সবশেষে রাজকন্যা পানি পান করে বলল, পানি দুর্গন্ধ মুক্ত।

তখন সবাই লোকটিকে বাহবা দিতে লাগল। মহারাজও প্রশংসা করতে লাগলেন। রানি এগিয়ে এসে সবার উদ্দশ্যে বললেন, কারো বাইরেরটা দেখে তাকে অবহেলা করা অন্যায়। এই লোকটি আমাদের সবার চোখ খুলে দিয়েছে। দেহের ভেতরে রোগ রেখে বাইরে মলম লাগালে কিছু হয় না। রোগ যেখানে সেখানে চিকিৎসা করা দরকার।

লোকটিকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়ে বিদায় করা হলো। মহলে আবার হাসি আনন্দ ফিরে এল। ■

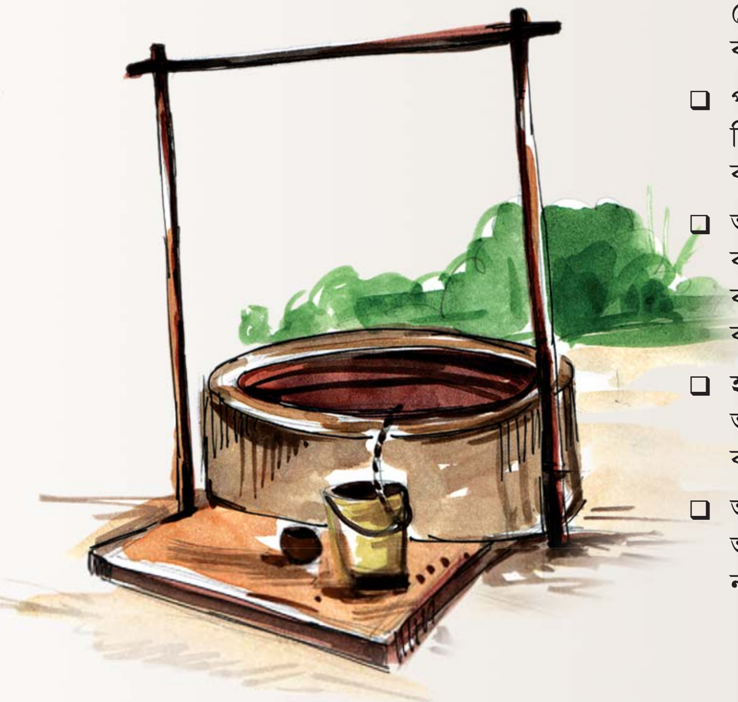

যে খাবারে বুদ্ধি বাড়ে

মো. জামাল উদ্দিন

বন্ধুরা, তোমরা তো সবাই চাও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে। সেজন্য মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। আর মস্তিষ্ক সতেজ রাখতে হবে। তাহলে সাফল্য অনিবার্য। আজ তোমাদেরকে কিছু খাবারের কথা জানাব যা বুদ্ধি বাড়াতে দারুণ কার্যকর।

- গবেষণায় দেখা গেছে টমেটোতে থাকা লাইকোপেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দেহে প্রবেশ করার পর ব্রেন সেলের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। আর সঙ্গে টক্সিক উপাদান যাতে মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখে।
- শরীরে জিঙ্কের মাত্রা যত বাড়বে বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ হতে শুরু করে। আর কুমড়োর বীজে আছে প্রচুর জিঙ্ক। তাই বুদ্ধি বাড়াতে এই খাবারের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।
- মাছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে দারুণ কার্যকর। এই উপাদান মস্তিষ্কের যে অংশটা স্মৃতিশক্তির আধার, সেই অংশের ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে।
- একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিদিন ডিম খেলে দেহে বিশেষ এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বাড়ে। যা ব্রেন সেল সুরক্ষায় ভূমিকা রাখে।
- পালংশাক-এ উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন কে, ফলেট এবং লুটেইন ব্রেনের কার্যক্ষমতা বাড়াতে দারুণ কাজে আসে।
- অলিভ অয়েল-এ পলিফলন নামে একটি উপাদান কাজে আসে। উপাদানটি নার্ভ সেলের কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়তে শুরু করে।
- হলুদের প্রাকৃতিক উপাদানটি মস্তিষ্কের জন্য অনেক কার্যকরী। একদিকে যেমন মস্তিষ্কের প্রদাহ কমায়, অন্যদিকে বুদ্ধি বিকাশেও সাহায্য করে।
- আখরোটে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, কপার, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফাইবার যা নানাভাবে মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়তে কাজে লাগে। ■

নিবন্ধ

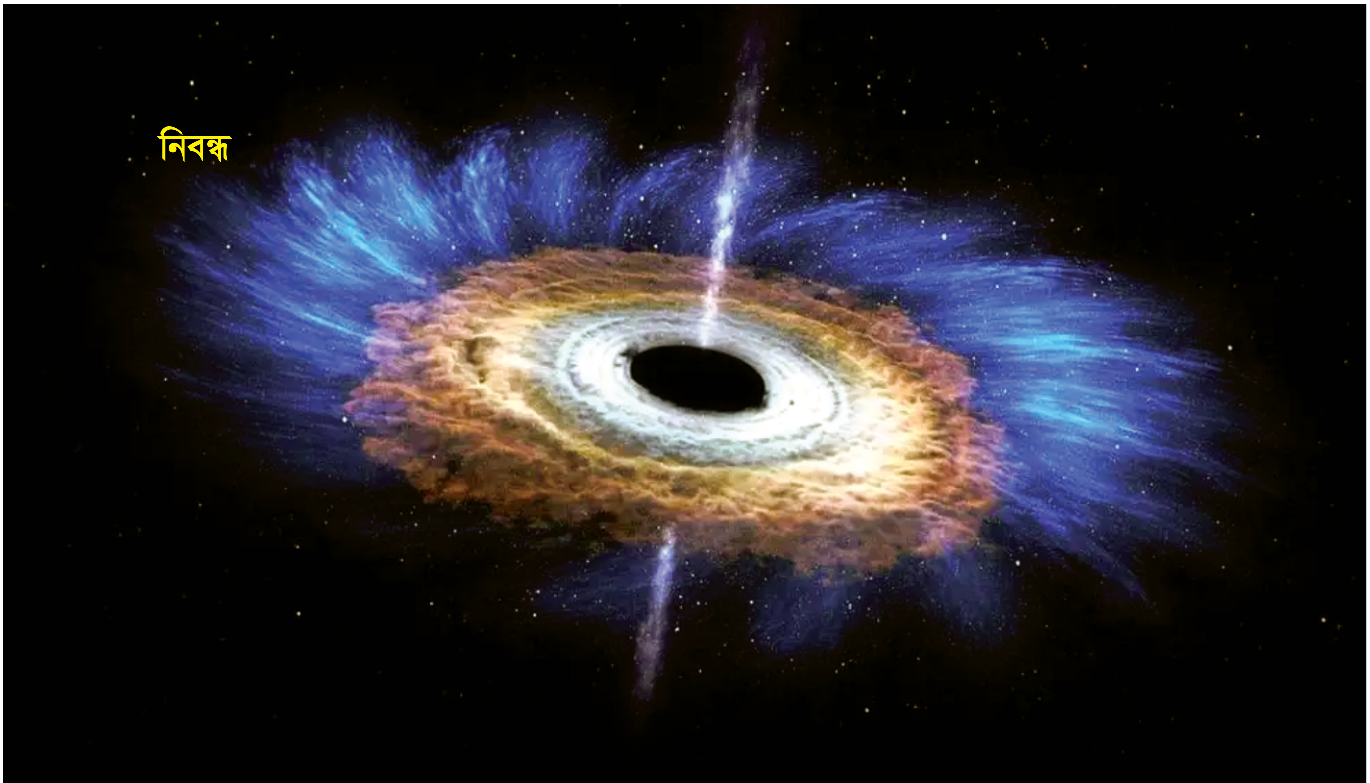

কৃষ্ণবিবর কী মহাকাশের সুড়ঙ্গ?

সানাউল্লাহ আল-মুবীন

(সদ্যপ্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং শ্রদ্ধাস্পদেষু)

যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার। *[রবীন্দ্রনাথ]*

ওপরের কথাগুলো রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক থেকে নেওয়া। নাটকটির নাম *রাজা*। এই নাটকের নায়ক একজন রাজা। তিনি একটি অন্ধকার ঘরে থাকেন। প্রজারা তাঁকে কোনোদিন দেখেনি। এমনকি রানিও না। অন্ধকার ঘরে রানিকে কেমন করে দেখতে পান, রানির এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি ওপরের কথাগুলো বলেছিলেন।

রাজাকে কেউ দেখতে না পেলে কী হবে, রাজ্যজুড়ে তাঁর প্রভাব। এটি মহাবিশ্বের এমন এক আধুনিক ধারণার সঙ্গে মিলে যায়, যাকে এখনো কেউ দেখতে পায়নি, কিন্তু তার অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমরা আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের কৃষ্ণবিবরের কথা বলছি। কৃষ্ণবিবর মানে কালো গর্ত। আমরা বলতে পারি কালো কুয়ো। কালো কুয়ো কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু কেউ এতে একবার পড়লে আর রক্ষা নেই।

কৃষ্ণবিবর বা কালো কুয়ো এক ধরনের মরা তারা। এখানে বস্তুপুঞ্জ এমন অকল্পনীয় ঘন হয়ে ওঠে যে, এর মহাকর্ষের টান কেউ এড়াতে পারে না। এমনকি মহাবিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী শক্তি আলোও না, যা মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে দৌড়াতে পারে প্রায় তিন লাখ কিলোমিটার।

রাতের আকাশে যে হাজার হাজার তারা আলোর ফুল হয়ে জ্বলে, তারা ছায়াপথ নামের এক বিশাল তারাবিশ্বের সদস্য। বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে, এখানে তারা আছে প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি। মহাবিশ্ব এ রকম কোটি কোটি তারাবিশ্ব দিয়ে ভরা। এসব বিশ্বে তারারা জন্মায়, বেড়ে ওঠে, বুড়ো হয়, মরেও যায়। সূর্যের চেয়ে অন্তত চারগুণ বেশি ভরের তারারা মৃত্যুদশায় পৌঁছে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে যায়। তারপর ধসে পড়ে নিজেদের ওপর। শেষ পর্যন্ত এরা এমন ঘন হয়ে ওঠে যে, কোনো কিছুই এদের মহাকর্ষের টান এড়িয়ে পালাতে পারে না। এমন অঞ্চল তখন

মহাবিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। আলো বেরোতে পারে না বলে এদের দেখা যায় না। তাই কৃষ্ণ বা কালো। কোনো বস্তু এখানে একবার পড়লে আর উদ্ধার নেই। তাই এটি বিবর বা গর্ত।

বিজ্ঞানীরা বলেন, তারারা মরে যায় তিন ভাবে। এদের প্রথম ধরনের মৃত্যু হয় সাদা বেঁটেতারা হিসেবে। সূর্যের সমান ভরের তারারা সাধারণত সাদা বেঁটেতারায় পরিণত হয়। মরার আগে প্রথমে এরা অত্যন্ত ফুলেফেঁপে এক একটি লাল দৈত্য তারা হয়ে ওঠে। তারপর একদিন শরীরের বাইরের খোলস ছেড়ে দিয়ে এরা হয়ে দাঁড়ায় সাদা বেঁটেতারা। তখন এদের বুকের ভেতরের পরমাণু চুলা নিভে যায় এবং ধীরে ধীরে এরা ঠান্ডা হয়ে চুপসে যায়। দ্বিতীয় ধরনের তারার মৃত্যু হয় নিউট্রন তারা হিসেবে। সূর্যের প্রায় দেড় গুণ ভরের তারারা পড়ে এই দশায়। নিজেদের ভর বইতে না পেরে এরা ধসে পড়ে নিজেদের ওপর। এই অবস্থায় এদের পরমাণুর ইলেকট্রন ও প্রোটন কণারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে পরিণত হয় নিউট্রন কণায়। সাধারণ পরমাণুর কেন্দ্র ও সীমান্তের বিশাল ফাঁক এখানে যায় উধাও হয়ে। সুতরাং তারাটি হয়ে যায় অত্যন্ত খুদে। তারাদের তৃতীয় ধরনের মৃত্যু কৃষ্ণবিবর বা কালো গর্তে। সূর্যের চারগুণ বা তার বেশি ভরের তারারা সাধারণত এই দশা প্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণবিবরের কথাই ধরা যাক। এরা মহাবিশ্বের অন্ধকার কূপ। অন্ধকার বলতে এখানে আলো জ্বলে না এ কথা বোঝানো হয়নি। এখান থেকে কোনো ধরনের তথ্য বেরোয় না বলে, মহাবিশ্বের অন্য কোনো অঞ্চল থেকে এদের দেখা যায় না বলেই আমরা এদের বলছি অন্ধকার কূপ। এসব আঁধার কুয়ো হতে পারে বিকিরণশীল। কিন্তু এদের বিকীর্ণ শক্তি এদের রাজত্বের বাইরে আসতে পারে না, ঘুরে বেড়ায় নিজের রাজ্যেই।

বিজ্ঞানী নিউটন মহাকর্ষের সূত্র ঘোষণা করেছিলেন সতেরো শতকের শেষ দিকে। সেই সূত্রমতে, মহাবিশ্বের সকল বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে টানে। গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ে, কারণ পৃথিবী তাকে নিচের দিকে টানছে। ওপর দিকে ঢিল ছুঁড়ে মারলে তা খানিক ওপরে উঠে আবার নিচে নেমে আসে। চাঁদ একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, পৃথিবী সূর্যকে। এই সবই ঘটে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে। আকাশের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ-সূর্য-নক্ষত্র এই নিয়মের অধীন।

পৃথিবীর চারপাশে চাঁদ একটি নির্দিষ্ট বেগে ঘোরে। বেগ এর কম বা বেশি হলে সে হয়ত মাটিতে নেমে আসবে, অথবা শূন্যে উড়ে যাবে। পৃথিবীর বেলায়ও এ কথা সত্যি। যে বেগে সে সূর্যের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেগ তার কম হলে সে সূর্যের অগ্নিকুণ্ডে লাফ দিয়ে পুড়ে মরবে, বেশি হলে সূর্যের বাঁধন কাটিয়ে মহাশূন্যে উড়ে যাবে। মহাকর্ষ সূত্রের সমীকরণ ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, কোনো বস্তুর জন্য পৃথিবীর ক্ষেত্রে তার পলাতকবেগ (কোনো বস্তু যে বেগে উড়াল দিলে পৃথিবীর বাঁধন কাটিয়ে শূন্যে উড়ে যাবে) হওয়া চাই সেকেন্ডে প্রায় বারো কিলোমিটার। এই বেগ আলোর বেগের মোটামুটি পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ। সূর্যের ক্ষেত্রে এই বেগ আরো পঞ্চাশ গুণ বেশি: প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ছশো কিলোমিটার। এটা আলোর বেগের প্রায় পাঁচশ ভাগের একভাগ। অর্থাৎ সূর্য যদি আরো পাঁচশ গুণ ভারী হতো, তবে তার ক্ষেত্রে কোনো কিছুর পলাতক বেগ হতো আলোর বেগের প্রায় সমান।

কৃষ্ণবিবর নামটি আধুনিক, কিন্তু তার ধারণাটি বেশ পুরোনো। আঠারো শতকের শেষ দিকে জন মিশেল নামে একজন ব্রিটিশ পাদরি ও শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেছিলেন, একটি তারা যদি হয় যথেষ্ট ভারী ও ঘন, তবে তার মহাকর্ষের টান এতই প্রবল হবে যে, সেখান থেকে কোনো কিছুই বেরোতে পারবে না, এমনকি তার বিকীর্ণ আলোও। এ ধরনের তারাদের তিনি নাম দিয়েছিলেন অন্ধকার তারা। এর কিছুদিন পর ফরাসি বিজ্ঞানী পিয়ের সাইমন লাপলাস মত প্রকাশ করেছিলেন যে, কোনো তারার ব্যাস যদি হয় সূর্যের ব্যাসের আড়াইশ গুণ ও ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের সমান, তবে তার প্রবল মহাকর্ষের প্রভাবে তার বিকীর্ণ আলো আমাদের কাছে আসবে না; ফিরে যাবে তার নিজের কাছে। আকাশের ভারী ও উজ্জ্বল তারারা এ কারণে অদৃশ্য থাকতে পারে।

এরপর বিশ শতকের শুরুতে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিকতত্ত্ব ঘোষণা করেন। এই তত্ত্বে তিনি বলেন, মহাবিশ্বে সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক, কেবল আলোর বেগ ছাড়া। আলোর বেগ ছাড়া এই মহাবিশ্বে পরম বলে কিছু নেই, এবং এ বেগ ধ্রুব। অর্থাৎ আলোর উৎস বা পর্যবেক্ষকের অবস্থা যা-ই হোক – স্থির বা

গতিশীল, আর যেভাবেই মাপা হোক – আলোর বেগ সব সময় একই পাওয়া যাবে। আর বিশ্বের কোনো বস্তুই আলোর বেগের চেয়ে বেশি বেগে ছুটতে পারবে না। এই তত্ত্বে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের একটি আশ্চর্য ব্যাখ্যা দিলেন আইনস্টাইন। তিনি বললেন, মহাকর্ষ শক্তি বলে কিছু নেই, যা আছে সে হচ্ছে বস্তুর উপস্থিতিতে দেশকালের বাঁকানো গুণ। বস্তুর উপস্থিতি ঘটলে দেশকাল বেঁকে যায় বলেই একটি বস্তু আকৃষ্ট হয় অন্য একটি বস্তুর দিকে। এ কারণেই গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ে, দূর আকাশের চাঁদ ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে। একই কারণে পৃথিবী ঘোরে সূর্যের চারদিকে, সূর্য-নক্ষত্ররা গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারদিকে। বস্তুর চারপাশের দেশকাল বাঁকা বলেই বিপুল বেগের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আলোকেও মানতে হয় এই বাঁকা বিশ্বের নিয়ম। অর্থাৎ কোনো ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলোর পথও বেঁকে যাবে।

১৯১৬ সালে এই তত্ত্বের সমীকরণ ব্যবহার করে জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল শোয়ার্জশিল্ড দেখালেন, কোনো তারা যদি হয় অত্যন্ত ঘন আর ভারী, তবে নিজের মহাকর্ষের প্রভাবে তারাটি এক সময় ধসে পড়বে নিজের ওপর। তখন সেটি এতই ছোটো আর ঘন হয়ে উঠবে যে, তার থেকে কোনো কিছু আর বাইরে বেরোতে পারবে না। তার পৃষ্ঠতল থেকে বিকীর্ণ আলো কিছু দূর এসে মহাকর্ষের টানে একটি বাঁকানো বৃত্ত পথ রচনা করে তারাটির চারপাশে ঘুরতে থাকবে। আলো বেরোবে না বলে মহাবিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল থেকে তাকে আর দেখা যাবে না। তখন সেটি হয়ে উঠবে একটি কৃষ্ণবিবর বা কালো কুয়ো। এই নামটি দেন পদার্থ বিজ্ঞানী জন হুইলার, ১৯৬৭ সালে।

কখন একটি তারা কৃষ্ণবিবর হয়ে ওঠে? সূর্যের মতো ভরের তারাদের নিয়তি সাদা বেঁটেতারায়। এর দেড় থেকে তিন গুণ ভরের তারারা ভাগ্য বরণ করে নিউট্রন তারার। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে গেলে আরো বেশি ভরের তারাদের নিজেদের মহাকর্ষের টান সামলানোর মতো শক্তি থাকে না, এরা চুপসে যেতে থাকে। চুপসে যেতে যেতে শেষে এরা কৃষ্ণবিবরে গিয়ে স্থিতি লাভ করে।

কৃষ্ণবিবরের একটি সংকটসীমা থাকে। বিজ্ঞানী কার্ল শোয়ার্জশিল্ড এটি অঙ্ক কষে বের করেছিলেন বলে একে শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধও বলা হয়। সংকটসীমা বা শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ হচ্ছে কৃষ্ণবিবরের কিনারা, যে কিনারা বরাবর আলো বৃত্তাকার পথে ঘোরে, যার ভেতরে ঢুকে পড়লে আর বেরুনোর কোনো উপায় থাকে না। এর বৈজ্ঞানিক নাম ঘটনাদিগন্ত। সমস্ত ঘটনা ওই দিগন্তের পারে হারিয়ে যায় বলে এই নাম। এটা কৃষ্ণবিবরের গা থেকে কত দূরে হবে সেটা নির্ভর করবে তার ভরের ওপর। ভর যত বেশি হবে, ঘটনাদিগন্তের সীমানা তত বড়ো হবে। সূর্যের সমান ভরের একটি কৃষ্ণবিবরের আকার হবে একটি ছোটো গ্রহাণুর মতো, ঘটনাদিগন্ত হবে এর পৃষ্ঠতল থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরত্বে। আর পৃথিবীর মতো ছোটো কোনো বস্তু যদি কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয়, তবে তার আকার হবে একটি ছোটো মারবেলের সমান, আর ঘটনাদিগন্ত হবে মাত্র এক সেন্টিমিটার দূরত্বে। কিন্তু পৃথিবীর মতো কোনো ছোটো জ্যোতিষ্ক তো দূরের কথা, সূর্যের মতো কম ভরের তারারাও কোনোদিন কৃষ্ণবিবর হতে পারবে না। কমপক্ষে চার সূর্য ভরের তারারাই কেবল এই পরিণতি পাবে।

কৃষ্ণবিবরের থাকে দুটো অংশ: কেন্দ্র ও সীমান্ত। একটি তারা যখন কৃষ্ণবিবরে পরিণত হয়, তখন সেটি হয়ে ওঠে দেশকালের এক অনন্য বিন্দু, যার ঘনত্ব প্রায় অসীম। এই অনন্য বিন্দুকে কৃষ্ণবিবরের কেন্দ্র হিসেবে ভাবা হয়। আমরা একে বলতে পারি কুয়োর তলা। আর সীমান্ত হচ্ছে তার ঘটনাদিগন্ত। একে অনেক সময় কৃষ্ণবিবরের পিঠও বলা হয়। কেন্দ্র ও সীমান্তের মধ্যবর্তী দূরত্বই শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ।

কৃষ্ণবিবর তো দেখা যায় না। কিন্তু কী করে বোঝা যাবে তার অস্তিত্ব? বোঝা যাবে তার মহাকর্ষের টান থেকে। কৃষ্ণবিবরের কাছাকাছি যদি অন্য কোনো তারা থাকে, তবে তার ওপর কৃষ্ণবিবরের প্রভাব থাকবে। আমাদের কাছ থেকে প্রায় ছয় হাজার আলোক বছর দূরে, আকাশের হংসমণ্ডলে রয়েছে সিগনাস এক্স-১ (আমরা বাংলায় বলতে পারি হংস ক-১) নামে একটি তারা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় রয়েছে দুটো তারা: একটি মহা দৈত্যাকৃতির এক অতি উজ্জ্বল ও উষ্ণ দৃশ্যমান নীলতারা। অন্যটি তার এক অদৃশ্য সঙ্গী। নীলতারাটি প্রায় তিন কোটি কিলোমিটার দূর থেকে ছয় দিনেরও কম সময়ে তার অদৃশ্য সঙ্গীকে প্রদক্ষিণ করছে। সঙ্গীটি সূর্যের চেয়ে প্রায় দশগুণ ভারী। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেটি একটি কৃষ্ণবিবর। কারণ

সাদা বেঁটেতারা বা নিউট্রন তারারা এত বেশি ভারী হতে পারে না। বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন, দৃশ্যমান নীলতারা থেকে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় সাত কোটি টন গ্যাস ঘুরতে-ঘুরতে তার অদৃশ্য সঙ্গীর দিগন্তের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের রাজা যেমন বলেছেন, যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার তাঁর আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে, ঠিক যেন তেমনই।

সিগনাস এক্স- ১ আমাদের খুঁজে পাওয়া প্রথম কৃষ্ণবিবর। এর কথা জানা গিয়েছিল ১৯৭১ সালে, কেনীয় উপকূল থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালির যৌথ উদ্যোগে ছোঁড়া কৃত্রিম উপগ্রহ উহুরু-র মাধ্যমে (সোয়াহিলি ভাষার এই শব্দটির অর্থ স্বাধীনতা)। এরপর ছায়াপথে ও অন্যান্য বিশ্বে আরো হাজার-হাজার কৃষ্ণবিবরের খোঁজ পাওয়া গেছে। এরা আছে অদৃশ্য অবস্থায়। এদের প্রত্যেকের ভর সূর্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি এবং প্রত্যেকের মহাকর্ষের অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা রয়েছে এক বা একাধিক দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য তারা, আকারে ও ভরে যারা সূর্যের সমান বা তার চেয়েও বেশি। তারাগুলো ঘুরছে কৃষ্ণবিবরগুলোর চারপাশে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ছায়াপথ এবং অন্য প্রতিটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে রয়েছে এক বা একাধিক বিপুলভর কৃষ্ণবিবর, যাদের মহাকর্ষের টানে আটকে আছে গ্যালাক্সির হাজার-কোটি তারা। এদের গা থেকে প্রতি মুহূর্তে বিপুল পরিমাণ গ্যাস ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে ঢুকে যাচ্ছে কৃষ্ণবিবরের অতল অন্ধকারে।

> **কৃষ্ণবিবরের কথাই ধরা যাক। এরা মহাবিশ্বের অন্ধকার কূপ। অন্ধকার বলতে এখানে আলো জলে না এ কথা বোঝানো হয়নি। এখান থেকে কোনো ধরনের তথ্য বেরোয় না বলে, মহাবিশ্বের অন্য কোনো অঞ্চল থেকে এদের দেখা যায় না বলেই আমরা এদের বলছি অন্ধকার কূপ**

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, ছায়াপথের কেন্দ্রের কৃষ্ণবিবরটির ভর হবে অন্তত চল্লিশ লাখ সৌর ভরের সমান। আমাদের পাশের বিশ্ব আনদ্রোমিদার কেন্দ্রে আছে অন্তত পনেরো কোটি সৌরভরের এক দানব কৃষ্ণবিবর। প্রায় পঁচাত্তর কোটি আলো বছর দূরের একটি উপবৃত্তাকার বিশ্বের কেন্দ্রে আছে এমন দুটো দানব কৃষ্ণবিবর, যাদের মিলিত ভর প্রায় দেড়হাজার কোটি সৌর ভরের সমান। পঁয়ত্রিশ কোটি আলো বছর দূরের অন্য একটি উপবৃত্তাকার বিশ্বের কেন্দ্রে এমন এক মহাদানব কৃষ্ণবিবরের খোঁজ পাওয়া গেছে, যার ভর সূর্যের ভরের দুহাজার কোটি গুণেরও বেশি। এটিই এ যাবৎ আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড়ো কৃষ্ণবিবর।

নক্ষত্রের যে গ্যাসপুঞ্জ প্রতিনিয়ত কৃষ্ণবিবরের অতলে গিয়ে পড়ছে, তা কোথায় যাচ্ছে? সে কি আমাদের পরিচিত দেশকাল থেকে চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে, না কি অনন্ত মহাবিশ্বের বিরাট পরিসরে, অন্য কোনো দেশে, অন্য কোনো কালে ফোয়ারার মতো উথলে উঠছে? এমন যদি হয়, তবে কৃষ্ণবিবরগুলো হয়ত হবে মহাকাশের এক-একটি সুড়ঙ্গ, যেগুলোর ভেতর দিয়ে অতি অল্প সময়ে ভ্রমণ করা যেতে পারে অন্তর্নাক্ষত্রিক বা অন্তর্বৈশ্বিক শূন্যস্থানে: হয়ত সুদূর অতীতে, কিংবা অনাগত ভবিষ্যতে।

তবে কৃষ্ণবিবরের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করা হবে অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কারণ যে মহাকাশতরি কৃষ্ণবিবরের ঘটনাদিগন্ত ভেদ করে ভেতরে ঢুকবে, কৃষ্ণবিবরের তীব্র মহাকর্ষ ও শক্তিশালী বিকিরণ তাকে আর আস্ত রাখবে না, ছিঁড়ে-পিষে-পুড়িয়ে চ্যাপটা, সুতোর মতো লম্বা ও কালো অঙ্গার করে ফেলবে। মহাকাশচারীও তখন অক্কা পাবে। তুমি যদি কোনোভাবে কৃষ্ণবিবরের মহাকর্ষবল ও বিকিরণকে অতিক্রম করতে পারো, তবে মহাকাশের সুড়ঙ্গ দিয়ে গিয়ে হয়ত পৌঁছে যাবে দেশকালের ভিন্ন কোনো বিন্দুতে, যেখানে তোমার গ্রহ হয়ত অন্যরকম। সেখানে আছে হয়ত অন্যরকম চাঁদ, অন্যরকম সূর্য, অন্যরকম তারা, আকাশ; কালের চেহারা হয়ত ভিন্ন। মহাবিশ্ব যে কত রহস্যময় হতে পারে, কৃষ্ণবিবর তার একটি উদাহরণ।

কৃষ্ণবিবর বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু তার ভেতরটা কেমন? নাটকের রাজা থাকেন একটি অন্ধকার ঘরে। কিন্তু বাস্তবে কোনো দেশের রাজা

অন্ধকার ঘরে থাকেন না। থাকেন আলো-ঝলমল ঘরে। কৃষ্ণবিবর – আমাদের এই মহাকর্ষীয় রাজা, দেশকালের এই অনন্য সুড়ঙ্গ সবক্ষেত্রে অন্ধকার না-ও হতে পারে। এদের কোনো কোনোটি হতে পারে আলো-ঝলমল। দৃশ্য আলোতে না হলেও অদৃশ্য বিকিরণে তো অবশ্যই। কিন্তু বাইরে থেকে এদের দেখার উপায় নেই। যে মহাবিশ্বের আমরা অধিবাসী, তাকে আমরা দেখি ভেতর থেকে। এই মহাবিশ্ব অদৃশ্য আলো, অর্থাৎ বিকিরণে পূর্ণ। এর কোনো-কোনো অঞ্চল দৃশ্য আলোয় আলোকিত। যেমন দিনের বেলা আমাদের সুন্দর এই পৃথিবী, সৌরজগৎ, ছায়াপথ ও অন্যান্য বিশ্ব। আমাদের সূর্যের বা অন্যান্য তারা ও গ্যালাক্সির আলো মহাবিশ্বের বাইরে যেতে পারে না। এই মহাবিশ্ব ছাড়া অন্য কোনো মহাবিশ্ব যদি থাকে, তবে সেসব মহাবিশ্বের অধিবাসীরা আমাদের মহাবিশ্বকে কোনোদিন দেখতে পাবে না। কারণ এখান থেকে আলো বা অন্য কোনো তথ্যের সংকেত ওদের কাছে পৌঁছাবে না কোনো দিন। এদিক থেকে চিন্তা করলে মহাবিশ্ব নিজেই এক মহাকৃষ্ণবিবর। এই বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে কার্ল সাগান নামে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী বলেছেন: কৃষ্ণবিবরের ভেতরটা কেমন, তা যদি তোমার জানতে ইচ্ছে করে, তবে দেখে নাও তোমার চারপাশ।

নিউটনের বিশ্বে দেশ ও কাল দুটো পরম অনুষঙ্গ। অর্থাৎ কোনো অবস্থায়ই এদের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বে আলোর গতি ছাড়া মহাবিশ্বে আর সবকিছুই আপেক্ষিক। কাজেই আমাদের দেশ কালের বোধ ব্যক্তিগত এবং এটি নির্ভর করে আমাদের অবস্থার ওপর। আমরা কোথায় আছি, কী অবস্থায় আছি, তা তৈরি করে দেয় আমাদের কালের বোধকে। দেশের ওপর বস্তুর যেমন প্রভাব রয়েছে, তেমনি রয়েছে কালের ওপরও। আমরা ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে ত্রিশ হাজার আলো বছর দূরে রয়েছি বলে এবং সূর্য নামক মাঝারি ভরের একটি তারা থেকে পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে রয়েছি বলে, পৃথিবী তার নিজের অক্ষের ওপর চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পাক খাচ্ছে বলে এবং আমাদের সঙ্গে নিয়ে মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে তিরিশ কিলোমিটার বেগে উড়ে বেড়াচ্ছে বলে আমরা অর্জন করেছি আমাদের দেশকালের বর্তমান বোধ। এখানে আমরা দিন গুনি চব্বিশ ঘণ্টায়, বছর তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে। কিন্তু কৃষ্ণবিবরে বিপুল পরিমাণ বস্তুপুঞ্জ একটি বিন্দুতে সংহত হয়ে আছে বলে তার কাছের দেশ অতিশয় দুমড়ানো, মোচড়ানো। এই মোচড়ানো দেশে আলোর মতো দ্রুতগামী শক্তি বাধ্য হয় ঘটনা দিগন্তের কিনার ঘেঁষে একটি বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করতে। এখানে বস্তু দেশকে যেভাবে বাঁকিয়ে দেয়, একইভাবে কালকেও দেয় বদলে। এর প্রবল মহাকর্ষক্ষেত্রে কালের গতি মন্থর। কোনো মহাকাশচারী যতই কাছাকাছি যাবে একটি কৃষ্ণবিবরের, তার কাছে কাল ততই দীর্ঘায়িত হবে। মহাকাশচারীর কেবল যান্ত্রিক ঘড়িতে নয়, তার জৈবিক ঘড়িতেও যখন সে কৃষ্ণবিবরের ঘটনা দিগন্ত ভেদ করবে, লোপ পাবে তার ব্যক্তিগত কালবোধ। অবশ্য তখন যদি আদৌ সে জীবিত থাকে।

স্টিফেন হকিং নামে একজন আধুনিক মহাবিশ্ববিদ কৃষ্ণবিবর নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কৃষ্ণবিবররা বিকিরণশীল। এদের গা থেকে প্রতিনিয়ত শক্তির স্রোত বেরোয়। হকিং-এর নামে এই শক্তি স্রোতের নাম দেওয়া হয়েছে হকিং বিকিরণ। শক্তি বিকিরণ করতে করতে একদিন এরা উবে গিয়ে নেই হয়ে যেতে পারে। মহাবিশ্বের শুরুতে যেসব অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (আয়তনে একটি পরমাণুর কয়েক লক্ষ ভাগের এক ভাগ ভরে হিমালয় পর্বতের সমান) কৃষ্ণবিবর গঠিত হয়েছিল, তার হিসাবে, সেসব ইতোমধ্যেই উবে গেছে। কিন্তু একটি ছোটো গ্রহাণুর সমান কৃষ্ণবিবরের আয়ুষ্কাল হতে পারে মহাবিশ্বের বর্তমান বয়সের চেয়েও কোটি কোটি গুণ বেশি।

মহাবিশ্ব নিজে রহস্যময়। কৃষ্ণবিবরও এর একটি রহস্যময় অনুষঙ্গ। এটি ঘটনা দিগন্ত দ্বারা মোড়ানো এমন এক প্রবল মহাকর্ষ ক্ষেত্র, যেখানে বিপুল ভর সংকুচিত হয়ে প্রায় একটি বিন্দুতে সংহত হয়েছে। তা দেশকালে এমন এক ধরনের অনন্যতার সৃষ্টি করে, যা কিছুটা মহাবিশ্বের আদিম পরমাণুর সঙ্গে তুলনীয়। এর অতল অন্ধকারে কোনো বস্তু কেবল পড়তে পারে, কিন্তু এর তলা থেকে কোনোকিছু উঠে আসতে পারে না। মহাবিশ্বে এর বিপরীতে শ্বেতবিবর জাতীয় কী কিছু আছে, যেখানে কোনোকিছু পড়তে পারে না, কিন্তু শূন্যস্থান থেকে ফোয়ারার মতো বস্তুপুঞ্জ উথলে উঠতে পারে? গবেষণার মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণবিবর এবং মহাবিশ্বের এ ধরনের আরো অনেক রহস্যময় অনুষঙ্গ সম্পর্কে একদিন হয়ত আরো ভালোভাবে জানতে পারব। ■

মজার গল্প

শেয়ালের শাস্তি

হারুন রশীদ

সখীপুর তখন লতাগুল্ম আর ঘন জঙ্গলে ভরা ছিল। সবুজ বন-বনানিতে এলাকাটি এমনভাবে ছেয়ে ছিল যে, সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢুকতে পারত না বনের ভিতর। কিন্তু কালক্রমে অরণ্যচারী মানুষ লাঙলের ফলায় বন কেটে উজাড় করে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। তখন বনের পশুপাখিরা পড়ে মহা বিপদে। সেই বিপদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য একটি ভয়ার্ত শেয়াল ছানা আশ্রয় নেয় এক কৃষকের বাড়িতে।

শেয়ালটি ছিল ভীষণ ধূর্ত। তাই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই শেয়ালটি কৃষক আর কৃষানির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলে। কৃষকের পরিবারে কোনো ছেলেপুলে ছিল না। শেয়ালটিকে তারা নিজেদের সন্তানের মতোই আদরে লালনপালন করতে লাগলেন।

কৃষক হাটবাজারে গেলে কখনো খালি হাতে ফেরেন না। মোয়া-মুড়কি যাহোক শেয়ালের জন্য নিয়ে আসেন। কৃষানিও কখনো শেয়ালটাকে চোখের আড়াল করেন না। কোনো অসুখবিসুখ হলে ডাক্তার কবিরাজ পর্যন্ত ডেকে আনেন বাড়িতে। রাতে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে শেয়াল ছানার দু-চোখে ঘুম ছড়িয়ে দেন কৃষানি-

শেয়াল ছানা শেয়াল ছানা
তুমি মোদের লক্ষ্মীসোনা।
আয়রে আয় ঘুমের মাসি
তোকে দেবো তিনটি দাসী।
এক দাসী গাইবে গান
আরেক দাসী নাচবে।
পান খেয়ে লাল ঠোঁটে
আরেক দাসী হাসবে।

এভাবে আদরযত্নে দিনে দিনে শেয়াল ছানাটি বড়ো হয়ে উঠে। ভোরবেলা হুক্কাহুয়া ডেকে কৃষক-কৃষানির ঘুম ভাঙায়। হাল চাষ করতে গেলে কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে শেয়ালও মাঠে যায়। কৃষানি কৃষকের জন্য ক্ষেতে খাবার নিয়ে গেলে তখন তার সঙ্গে বাড়ি ফেরে শেয়াল।

এভাবে দিন ভালোই যাচ্ছিল। কিন্তু কথায় আছে, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়'। শেয়ালের বেলায়ও ব্যাপারটি ঘটল।

যতই দিন যায় শেয়ালের মনের মধ্যে নানা কূটবুদ্ধি আঁকুপাঁকু করে। কৃষানির তরতাজা নরম তুলতুলে মুরগির ছাগুলো দেখে তার জিহ্বায় পানি পড়ে। সে ভাবে, ইশ্! এগুলো যদি ধরে ধরে খাওয়া যেত তাহলে কী মজাই না হতো। অথচ কৃষানি তাকে কত আদরযত্নই না করে। কখনো অভুক্ত রাখে না। খাওয়ার সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ালকে খাবার দেওয়া হয়। সে যদি বনে থাকত তাহলে এত খাবার কিছুতেই জুটত না। কিন্তু অকৃতজ্ঞ শেয়ালটি যতই আদর পায়, তার আফসোস যায় আরো বেড়ে। সে ভাবে, এর চেয়ে বনে থাকলেই সে ভালো থাকত।

একদিন কৃষক আর কৃষানি গেছে মাঠে কাজ করতে। শেয়াল একা বাড়িতে। কৃষানি মাঠে যাওয়ার সময় শেয়ালকে বলে যায়, সে যেন ছোট্ট মুরগির ছাগুলোকে চিল আর বনবিড়ালের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

শেয়াল মাথা বাঁকিয়ে কৃষানিকে আশ্বস্ত করায় কৃষানি নিশ্চিন্ত মনে মাঠে যায়। সন্ধ্যা হলে কৃষানি মাঠ থেকে ফিরে মুরগির ছাগুলোকে ঘরে নিতে যাবে তখন গুনে দেখে ১৬টি ছার মধ্যে দুটি নেই।

কৃষানির ফুটফুটে মুরগির ছাগুলোর জন্য ভীষণ মায়া হতে লাগল। শেয়ালকে ডেকে ছাগুলোর কথা জিজ্ঞেস করার পর শেয়াল চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, সারাদিন পাহারা দিতে দিতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার চোখে হালকা ঘুম চলে এসেছিল। মনে হয় এই ফাঁকে চিল অথবা বনবিড়াল এসে ছাগুলোকে খেয়ে ফেলেছে।

পরের দিন শেয়ালকে যথারীতি পাহারায় রেখে আবারো মাঠে গেল কৃষানি। এবার তার উপর দায়িত্ব পড়ল মাচার উপর মুরগির ডিমগুলো পাহারা দেওয়ার।

সকাল গিয়ে দুপুর। শেয়ালের পেটের ক্ষুধা বেড়ে চলল। কৃষানির রেখে যাওয়া খাবার খেয়ে তার পেট ভরলেও চোখ ভরল না। তাই মাচার ওপর রাখা ডিমগুলোর কথা ভাবতে লাগল। দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেলো তার মাথায়। সে ভাবল কাল যখন মুরগির ছাগুলো খেয়ে হজম করতে পেরেছি আজ ডিম খেলেও একটা কিছু বলে পার পাওয়া যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। এক দৌড়ে মাচার ওপর উঠে সে টপ টপ করে দুটো ডিম খেয়ে নিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে লাগল।

কাজ শেষে কৃষানি বাড়ি ফিরে হাত মুখ ধুয়ে মাচার ওপর কাস্তে রাখতে গিয়ে দেখল দুটো ডিম কম। শেয়ালকে এর কারণ জিজ্ঞেস করার পর শেয়াল বলল, আমি সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিলাম। উঠান ছেড়ে যেই না বাড়ির উত্তর পাশে গেছি দেখি একটা কালো বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এ নিশ্চয়ই সেই বিড়ালটির কাজ।

কৃষানি বলল, হায় আমার কপাল! আমি তোকে রাখি পাহারায় আর তুই কিনা হাওয়া খেয়ে বেড়াস।

এরপর থেকে কৃষানি বাড়ির বাইরে গেলে ঘরে তালা দিয়ে শেয়ালকে সঙ্গে নিয়ে যায়। এদিকে একদিন দুপুর বেলা মাঠ থেকে কৃষক ঘেমে নেয়ে বাড়ি ফিরে এল। কাঁধ থেকে লাঙল-জোয়াল নামাতে নামাতে বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে কৃষানি। আর বোধহয় মাঠে হাল চাষ করতে পারব না।

কেন কী হয়েছে?

মাঠে হাল চাষ করছিলাম এই সময় উত্তর দিকের বন থেকে একটা ডোরাকাটা ইয়া বড়ো বাঘ এসে হুংকার দিয়ে বলল, ভীষণ ক্ষুধা আমার পেটে। তোর বলদ দুটো দেখছি বেশ মোটা তাজা। অনেক দিন মাংস খেতে পাইনি। তোর বলদ দুটো আমি খাব। এই বলে বাঘ মেরুদণ্ড সোজা করে বসে জিহ্বা বের করে তার থাবা চাটতে লাগল।

কৃষানি বলল, তুমি কী বললে?

কৃষক বলল, কী আর বলব, বাঘকে অনুনয় করে বললাম, দেখ বাঘ মামা আমার এই দুটো মাত্র বলদ। এগুলো তুমি খেয়ে ফেললে আমি হালচাষ করতে পারব না। তখন আমাকে না খেয়ে মরতে হবে। একথা শুনে বাঘ বলল, তুমি না খেয়ে মরবে কিনা তার আমি কী জানি। আমি সাফ সাফ বলে দিচ্ছি, বলদ দুটো আমাকে না দিলে শেষে তোকেই ধরে খাব। উপায়ান্তর না দেখে বললাম, বাঘ মামা বাড়িতে একটি নাদুসনুদুস গাভি আছে। এই বলদ দুটো না খেয়ে তুমি না হয় গাভিটাই খেলে।

বাঘ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, তুমি যখন এত করে বলছ তখন না হয় তাই হবে।

একথা শুনে কৃষানি রেগেমেগে বলল, বাঘকে কিছুতেই গাভিটাকে দেওয়া যাবে না। গাভিটার দুধ বেচে সংসার চলছে, তোমার জানা নেই?

তাহলে বাঘ তো আমাকেই ধরে খাবে, মাথা চুলকিয়ে কৃষক বলল।

কৃষানি বলল, তুমি কোনো চিন্তা করো না। কাল আগের মতোই মাঠে যাবে, দেখি কী করা যায়।

পরদিন। গর্জন ছেড়ে বাঘ বলল, কী কৃষক ভাইয়া, গাভিটা নিশ্চয়ই এনেছ। কোথায় রেখেছ সেটাকে? আমার যে ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে।

কৃষক আঙুল উঁচু করে দক্ষিণ দিকে দেখিয়ে বলল, ওই যে ওদিকে।

বাঘ লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। কিন্তু একি দেখছে সে? এ যে এক ভয়ানক অচিন জীব। বোধ হয় দৈত্য-

দানব হবে। বাঘ দৈত্য-দানবের নাম শুনেছে-কিন্তু চোখে দেখেনি। দেখতে দেখতে ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া দানবটি বাঘের একেবারে কাছে এসে বলল, কী কৃষক ভাই! তোমাকে একটি বাঘ আনতে বলেছিলাম। কতদিন বাঘের মাংস চিবিয়ে খাই না। দাঁতগুলো আমার ময়লা হয়ে গেছে।

কৃষক বলল, হ্যাঁ ভূতের রাজা, এই যে আপনার জন্য আনা বাঘ।

ঘোড়ায় চড়া দৈত্যটি তখন বলল, এত ছোটো বাঘ খেয়ে তো আমার কিছুই হবে না।

একথা শুনে প্রাণপণ দৌড়ে পালাল বাঘটি। আর মাথার মুখোশটা সরিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে হাসতে হাসতে নেমে এল কৃষানি।

এদিকে সবকিছু খেয়াল রাখছিল শেয়াল। সে ভাবল এই এক মোক্ষম সময়। কৃষক আর কৃষানিকে বাঘের পেটে দিতে পারলে সে মুরগির ছা আর ডিমগুলো পেট ভরে খেতে পারবে। এই ভেবে শেয়াল গেল বাঘের কাছে। বাঘের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলল। বলল যে, বাঘ মামা তুমি যে দৈত্য দেখে ভয় পেয়েছ, সেটা আসলে কৃষানি।

বাঘ মিনমিন করে বলল, কিন্তু শেয়াল পণ্ডিত আমি যে দেখলাম দৈত্যটার হাতির মতো বড়ো বড়ো দাঁত। ওটা কৃষানি হয় কী করে।

শেয়াল বলল, তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে এই তোমার লেজের সাথে আমার লেজ বেঁধে দিলাম। এবার চলো।

কৃষক মাঠে হাল চাষ করছিল। বাঘ এসে মহা হুংকার দিয়ে বলল, এই কৃষক তোর এত বড়ো সাহস! কৃষানিকে দিয়ে আমাকে ভয় দেখাস। বলদের আগে তোকেই আজ আস্ত চিবিয়ে খাব।

দূর থেকে সবকিছু শুনে কৃষানি ভাবল, ওরে অকৃতজ্ঞ শেয়াল তুই নিজেকে এত চালাক ভাবিস কেন। সব শেয়ালই পণ্ডিত হয় না। আজ তা তুই টের পাবি।

এরপর কৃষানি আগের মতো ঘোড়ায় চড়ে এসে শেয়ালকে বলল, শেয়াল মামা তুমি দেখছি বেশ উপকারী বন্ধু। কাল বাঘটাকে হাতের কাছে পেয়ে খেতে পারিনি। পালিয়ে যাওয়া বাঘটিকে ধরে নিয়ে আসতে বলেছি আর তুমি ঠিক নিয়ে এসেছ। তা তোমাকে কী দিয়ে যে ধন্যবাদ জানাই।

একথা শোনার পর বাঘ ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে দিগ্বিদিক দৌড়ে পালাতে লাগল। শেষে তার আস্তানায় গিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচল।

এদিকে বাঘের লেজের সঙ্গে বাঁধা থাকায় মাটিতে আছাড় খেয়ে, কাঁটা ঝোপঝাড়ের আঘাত পেয়ে শেয়ালের শরীরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। যন্ত্রণাকাতর শরীর নিয়ে সে ভাবতে লাগল, উপকারীর অপকার করা তার মোটেও উচিত হয়নি। ■

শিয়াল

মো. আবীর আহমেদ

শিয়াল হলো চালাক প্রাণী
জানি আমরা সকলে
সকাল-সন্ধ্যা ছুটে বেড়ায়
বন-বাদাড় আর জঙ্গলে।

যায় না তাকে সহজে
করা যে বোকা
তার বুদ্ধিতে সব পশুরা
খায় যে অনেক ধোকা।

৮ম শ্রেণি, হায়দার আলী স্কুল, মুগদা,ঢাকা

বিজয় ফুল

কাশ্মিরের লোককাহিনি

পাগল আজুবামাল

অনুবাদক: রাকিবুল রকি

অনেক অনেক দিন আগের কথা, কাশ্মিরে তখন অনেকগুলো ছোটো ছোটো স্বাধীন রাজ্য ছিল। প্রতিটি রাজারই দেশ পরিচালনা করার জন্য নিজস্ব নিয়মনীতি ছিল। সেভাবেই তারা রাজ্য শাসন করতেন। এমনই একটি স্বাধীন রাজ্যের রাজা ছিলেন আজুবামাল। তিনি তার রাজ্যে এক অদ্ভুত নিয়ম চালু করেছিলেন। সব জিনিসপত্রের দাম সমান, এক পয়সা করে।

আজুবামাল খুবই বোকা এবং স্বার্থপর রাজা ছিলেন। তিনি বেশ কজন মন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন। মন্ত্রীদের মূল কাজ ছিল রাজাকে তোষামোদ করা। চাটুকার মন্ত্রীদের সাথে কথা বলে রাজা সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতেন। রাজ্যের লোকজন এইসব রাজকর্মচারীদের জন্য সব সময় আতঙ্কে থাকত।

একবার তিনজন বন্ধু এ রাজ্যে ভ্রমণ করতে এল। সবকিছু দেখেশুনে প্রথম দুজন বন্ধু বলল, এ জায়গা বসবাসের যোগ্য নয়। চল ফিরে যাই। এ দেশের রাজা পাগল। কিন্তু তৃতীয় বন্ধু সমস্ত জিনিসপত্রের দাম দেখে এখানেই থাকার চিন্তা করল। সে বলল, 'আমরা এখানে খুব সুখেশান্তিতে বসবাস করতে পারব।'

প্রথম দুই বন্ধু অনেক চেষ্টা করল তৃতীয় বন্ধুকে বুঝিয়ে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তৃতীয় বন্ধু তার সিদ্ধান্ত বদলাল না। শেষ পর্যন্ত তারা দুইজন চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

যাবার সময় তৃতীয় বন্ধুকে বলল, যদি ভবিষ্যতে কখনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন তাদের যেন খবর দেওয়া হয়। তারপর প্রথম দুই বন্ধু রাজ্য ছেড়ে চলে গেল।

পরের দিন সকালে তৃতীয় বন্ধু মিষ্টি কেনার জন্য বাজারে গেল। মিষ্টি কিনে খেতে বসবে এমন সময় কয়েকজন সৈন্য এসে তাকে আটক করল।

তাকে আটক করার কারণ জিজ্ঞেস করতেই এক সৈন্য বলল, 'গত রাতে রাজপ্রাসাদে চুরি হয়েছে। তাই রাজা হুকুম দিয়েছেন কোনো আগন্তুক দেখলেই তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ রাজার ধারণা, কোনো আগন্তুকই এই অপরাধ করেছে। রাজা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। আর তুমিই রাজ্যে একমাত্র অপরিচিত ব্যক্তি, আগন্তুক।'

তৃতীয় বন্ধু বুঝতে পারল তাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। সে খুব ভয় পেয়ে গেল।

রাজার সামনে তাকে হাজির করা হলে সে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করল। বলল, তাকে যেন ফাঁসি দেওয়া না হয়। কিন্তু রাজা কোনো কথা শুনলেন না। তার ফাঁসির আদেশ বহাল রইল। অবশেষে সাহায্য প্রার্থনা করে প্রথম দুই বন্ধু কাছে চিঠি পাঠাল। রাজা তার ফাঁসির দিন নির্ধারণ করে দিলেন। শহরের মাঝখানে সবার সামনে তাকে ফাঁসি দেওয়ার নির্দেশ হলো।

ফাঁসির দিন সে বন্ধুদের কাছ থেকে আসা একটি চিঠি পেল। চিঠিতে লেখা, তাকে সাহায্য করার জন্য তারা আসছে।

ফাঁসির সময় হয়ে এল, জল্লাদ এসে তাকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে গেল। তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। এমন সময় তার বন্ধুরা এসে উপস্থিত হলো। প্রথম বন্ধু রাজাকে উদ্দেশ্য করে জোরে জোরে বলতে লাগল, 'আমি সত্যিকারের অপরাধী। আমাকে ফাঁসি দেওয়া হোক।'

দ্বিতীয় বন্ধু প্রথম বন্ধুর কথা শেষ হবার আগেই বলল, 'মহামান্য রাজা, সে মিথ্যে কথা বলছে। কারণ আমিই প্রকৃত অপরাধী।'

তখন তারা কে প্রকৃত অপরাধী এই নিয়ে একে অপরের সাথে ঝগড়া করতে লাগল। তারা দুজনেই প্রথমে ফাঁসিতে ঝুলতে চায়।

রাজা তিন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ব্যাপারখানা

কী বলো তো? তোমরা একজন আরেকজনের আগে ফাঁসিতে ঝুলে মারা যেতে চাচ্ছ কেন?'

তখন বন্ধুরা বলতে লাগল, 'মহামান্য রাজা, আজ খুবই পবিত্র দিন। কেউ যদি আজ মারা যায়, তাহলে সাথে সাথে সে স্বর্গে চলে যাবে।'

এইসব শুনে বোকা রাজা বলল, 'প্রিয় মন্ত্রী, রাজা হবার কারণে এই পবিত্র দিনে মারা যাবার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আমি। আমি ওদের পরিবর্তে ফাঁসিতে ঝুলতে চাই।'

দুষ্টু মন্ত্রী সিংহাসন দখল করার জন্য এমন সুযোগই খুঁজছিল। সে জল্লাদকে হুকুম করল, রাজাকে ফাঁসি দিতে। ওই দেশের প্রজারা মন্ত্রীর আসল উদ্দেশ্য জানত। তারা সবাই মিলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং মন্ত্রীকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিল। আর প্রথম বন্ধুকে ওই দেশের রাজা করা হলো। বাকি দুই বন্ধু হলো তার মন্ত্রী। তারপর সুন্দর মতো তিন বন্ধু দেশকে পরিচালনা করতে লাগল। লোকজনও সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। ■

নেই অহেতুক সংকোচ

জান্নাতে রোজী

দেশে ঋতুস্রাব বা মাসিক নিয়ে রাখঢাক এখন আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। এ বিষয় নিয়ে এখন ঘরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা, শিক্ষকরা, অভিভাবকরা কথা বলছে। মাসিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে মাসিকবান্ধব শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

সরকারি উদ্যোগ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাসিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে বর্তমান সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে সারা দেশে কো-এডুকেশনের (ছেলে ও মেয়ে একসঙ্গে পড়ছে) তিন হাজার বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। চারতলা ভবনের প্রতি তলায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশ ব্লক, মেয়েদের ঝুড়ি (বিন) রাখার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়ই শিক্ষার্থীদের মাসিক শুরু হয়। স্কুলে অনুপস্থিতি রোধ ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মাসিক ব্যবস্থাপনার দিকে সরকার বেশি জোর দিচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ষষ্ঠ শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বইটিতে ঋতুস্রাব বা মাসিককে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, সাধারণত ৯ থেকে ১২ বছর বয়সে মেয়েদের মাসিক শুরু হয়। মাসিক হলে কী ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, স্যানিটারি প্যাড বা কাপড় পরার নিয়ম, সে সময় কীভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, সব বলে দেওয়া হয়েছে বইয়ে।

বেসরকারি উদ্যোগ

নেদারল্যান্ডস সরকারের সহায়তায় ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দ্য রুরাল পুওরসহ (ডরম) চারটি সংগঠন যৌথভাবে ঋতু প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প পরিচালনা করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১০ থেকে ১৩ বছরের শিক্ষার্থীদের টার্গেট করে চারজন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে ঋতু স্টুডেন্ট ফোরাম, বিদ্যালয়ে ঋতু ডেস্ক, বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা জানানোর জন্য অভিযোগ বাক্স রাখা, শৌচাগার পরিষ্কারের জন্য লোক নিয়োগসহ মাসিকবান্ধব শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও অভিভাবকদের সচেতন করা হচ্ছে। এতে করে মাসিকের সময় স্কুলে ছাত্রী উপস্থিতি আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এবং জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম 'সেফ স্কুলস ফর গার্লস ক্যাম্পেইন' শিরোনামে ২০১৬ সাল থেকে একটি প্রকল্প পরিচালনা করছে।

সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ঋতুস্রাবের সময় এখন শিক্ষার্থীরা ইচ্ছে করলেই চেইঞ্জ করতে পারছে। তাছাড়া এসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং মেয়েদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার বিষয়টি সম্পর্কেও অভিভাবকদের সচেতন করা হচ্ছে। এ বিষয়টিকে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটি তাই অনেকাংশে কমে গেছে। ■

গল্প

লটারি

এশরার লতিফ

জলিল আহমেদ নীলক্ষেত মোড়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। বাস আসতে দেরি দেখে সে শাহ আলমের দোকানে ঢুকল। শাহ আলমের দোকানের পেছনের দিকের তাকগুলো দেশ-বিদেশের পুরনো বই আর ম্যাগাজিনে ঠাসা। সামনের লাইন করে বিছানো বাংলা ইংরেজি দৈনিক, সাপ্তাহিক এইসব। একটা পত্রিকা কিনতে না কিনতেই মিরপুর রুটের বাস চলে এল। জলিল আহমেদ লাফ দিয়ে বাসে চড়ে বসল। বসা বলতে চাপাচাপির ভেতর দাঁড়াবার একটা সুযোগ পেল আর কী।

বাসের ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়েও পত্রিকায় চোখ বুলাচ্ছিল। একটা খবরে এসে চোখ আটকে গেল। বাংলাদেশ মেডিকেল ফেডারেশনের লটারির ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। যে নম্বরগুলো দেখাচ্ছে, তার একটা জলিল আহমেদের খুব পরিচিত লাগছে। জলিল আহমেদের হঠাৎ হৃদকম্পন বেড়ে গেল, মনে হলো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

নম্বরটা জলিল আহমেদের মাথায় ছিল। ঘ ২৪৬০৮৯৭৪। এই লটারির টিকেট দিয়ে সে আগেও বলতে গেলে একটা পুরস্কার জিতেছে।

মাসখানেক আগে বারেকের টঙে বসে ওরা চা খাচ্ছিল। ওরা বলতে- জলিল, মুস্তফা, রুমি আর ফিরোজ। প্রায় শুক্রবার ওরা চেষ্টা করে একত্রিত হতে। বারেকের দোকান হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। যখন যেখানে সুবিধা। বারেকের দোকানের মাটির ভারের চা অতুলনীয়। এ কারণে ওখানেই বেশি বসা হয়। সেদিনও ওরা এভাবেই আড্ডা দিচ্ছিল। জুলাইয়ের প্রবল গরমের পর পড়ন্ত বিকেলে একটা হালকা নিম্নচাপ তৈরি হয়েছিল। দেখতে দেখতে আকাশ কালো করে ঝড় এল। এদিক-সেদিক একটু কাঁপিয়ে দিয়েই ঝড়টা বলা নেই কওয়া নেই হাওয়া হয়ে গেল। বারেকের দোকানের উপরের অর্ধেকটা জুড়ে একটা আমগাছের ডালপালা ছড়ানো। ঝড়ো বাতাসে কতগুলো কাঁচা আম টিনের চালায় লাফ দিয়ে মাটিতে গড়িয়েছিল। সেই আম তুলতে গিয়ে জলিল দেখল কোত্থেকে উড়ে এসে একটা লটারির টিকেট পড়ে আছে বেঞ্চের পাশে। মেডিকেল ফেডারেশনের লটারি, প্রথম পুরস্কার এক কোটি টাকা। টিকিটের মেয়াদ এখনো আছে। অন্য বন্ধুরাও টিকেট দেখে হামলে পড়ল। ঠিক

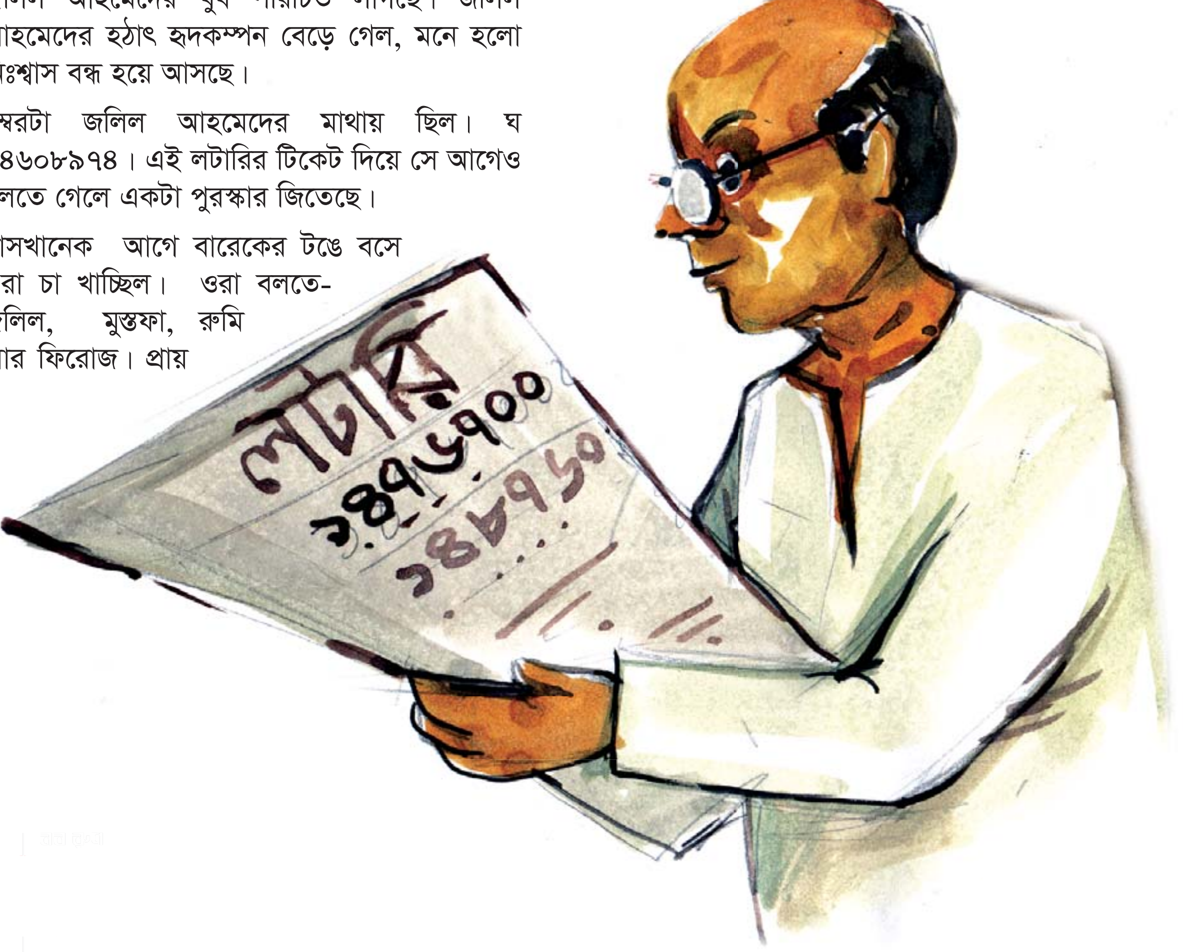

হলো টিকেটের পুরো নম্বর যে মুখস্থ করে আগে বলতে পারবে সে শুধু এক কাপ ফ্রি চা আর একটা কেকই পাবে না, টিকেটটাও তার হস্তগত হবে।

ছোটোবেলা থেকেই জলিলের স্মৃতিশক্তি ভীষণ প্রখর। দু' মিনিটের মধ্যে নম্বর মুখস্ত করে গড়গড় করে ও নম্বর বলে দিলো। অন্যরা প্রথম তিনটি সংখ্যাই ঠিক করে বলতে পারল না। লটারির টিকেট আর ফ্রি চা বিস্কুট জলিলের ভাগ্যেই পড়ল। সেই টিকেটের নম্বর মনে করেই জলিল এখন বাসে দাঁড়িয়ে ঘামছে।

দুই.

জলিল আহমেদের একমাত্র ছেলে রঞ্জু। ও শ্যামলী হাই স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। মিহির যখন প্রথম রঞ্জুদের ক্লাসে এল, কেউ তেমন নজর দিলো না। মলিন ইউনিফরম, হয়ত কোনো পুরনো কাপড়ের দোকান থেকে কেনা, চুলও ঠিকমতো আঁচড়ানো নেই। টিফিন টাইমে দেখা গেল ও কোনো টিফিন আনেনি। ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা ওর সঙ্গে কথা বলতে মোটেও আগ্রহ পেল না। মিহিরও কারো সঙ্গে সহজে মিশতে পারল না, সারাদিন কেমন মিইয়ে থাকল। সেইদিন একমাত্র রঞ্জুই মহা উৎসাহ নিয়ে মিহিরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল।

ক্লাসে টিচার যখন পড়াতেন, মিহির কোনো প্রশ্ন করত না। চুপ করে বসে থাকত। টিচার ক্লাসে প্রশ্ন করলে অনেকগুলো হাত উপরে উঠত। কিন্তু মিহির মাথা নিচু করে বসে থাকত। একমাস পর যখন রেজাল্ট বের হলো, সবাই হা হয়ে গেল। নতুন ভর্তি হওয়া ছেলেটা সবাইকে পিছে ফেলে ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে গেছে। এই ঘটনার পর মিহিরের বন্ধু সংখ্যা আরো কিছু বাড়ল। কিন্তু রঞ্জুই হলো ওর একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

গত বছর মিহির যখন বাবা-মার সাথে চাঁদপুর যাচ্ছিল তখন ঝড়ের ভেতর ওদের লঞ্চ ডুবে যায়। তখন মিহিরের বাবা-মা এবং আরো অনেকেরই সলিল সমাধি ঘটে। একটা কাঠের তক্তা ধরে মিহির যে কীভাবে বেঁচে যায় কে জানে। ওর এই দুঃখ-কষ্টগুলো এখন একমাত্র রঞ্জুই জানে। ওর যে বাবা-মা এমন কী কাছের কোনো আত্মীয় নেই সে কথাও আর কাউকে বলেনি।

ঢাকার শ্যামলীতে অনেকগুলো কাঁচা পাকা বাড়ির মাঝখানে প্রায় পাঁচ কাঠার মতো জমি বহুদিন খালি পড়েছিল। এক বছর আগে শ্যামলী সবুজ সংঘ এলাকার কাউন্সিলরের অনুমতি নিয়ে ওখানে একটা এতিমখানা তৈরি করে। প্রথম যে পাঁচজনকে এই এতিমখানায় আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল মিহির তাদেরই একজন। এতিমখানা যারা চালায় তাদেরও তেমন কোনো টাকা পয়সা নেই। ওরা শুধু এতিম ছেলেগুলোর ন্যূনতম চাহিদাগুলোই পূরণ করতে পারে। এজন্য মিহিরের মন সব সময়ই খারাপ থাকে।

তিন.

ঘরে এসে বাংলা ডিকশনারির ভেতরে রাখা লটারির টিকেটটা জলিল আহমেদ মিলিয়ে দেখল। না কোনো ভুল হয়নি। ঘ ২৪৬০৮৯৭৪। এক কোটি টাকা। ভাবা যায়? জলিল আহমেদ যদি বেতনের এক পয়সাও খরচ না করে, তাহলেও এক কোটি টাকা জমাতে তার লেগে যাবে বিশ বছর। এই টাকার সাথে আর সামান্য কিছু ঋণ নিয়ে এখনো ঢাকার কোথাও কোথাও ছোটোখাটো অ্যাপার্টমেন্ট কেনা সম্ভব। তাহলে অন্তত ওর স্ত্রী কনার একটা স্বপ্ন পূরণ হবে, ঢাকা শহরে নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট।

লটারির অর্থ প্রাপ্তির কথা জলিল বেশ কদিন চেপে রাখল। বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে ঘুরে শেষমেষ মিরপুরে একটা বাড়ি পছন্দ করে এল।

কনাকে আজ একটা সারপ্রাইজ দিতে হবে। গতকাল অ্যাপার্টমেন্টের ডাউনপেমেন্ট করার কথা হয়ে গেছে। খাবার টেবিলে বসে জলিল এসবই ভাবছিল। রঞ্জুর গোমড়া মুখ দেখে সে ভাবনায় হঠাৎ ছেদ পড়ল।

কী ব্যাপার রঞ্জু? কী হয়েছে?

মন খারাপ লাগছে। মিহিরের জন্য।

জলিল জানে মিহির রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিন্তু এর বেশি ও কখনো বলেনি।

কেন কী হয়েছে?

মিহির যে অরফানেজে থাকে সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ও অরফানেজে থাকে? আগে বলোনি তো?

হুম, ওর বাবা-মা নেই, এখন অরফানেজ বন্ধ হয়ে গেলে ও কোথায় যাবে জানে না।

বন্ধ হবে কেন বলেছে?

ওই জমিটা যাদের ছিল তারা এখন এটা বিক্রি করে

দিচ্ছে। যারা কিনেছে তারা বিদেশে থাকে। এখানে ওরা কী একটা কারখানা বানাবে। মিহির আর ওর বন্ধুদের দেখার আর কেউ থাকবে না।

যারা এটা চালা তো তারা কিছু করবে না? ওরা বাসা ভাড়া নিতে পারে না?

মিহির বলেছে যারা অরফানেজ চালায় তাদের নতুন করে কিছু করার ফান্ড নেই।

রঞ্জুর কাছে এসব শুনে জলিল একটু দমে গেল। অ্যাপার্টমেন্টের কথা এখন আর বলতে ইচ্ছে করছে না।

চার.

জলিল আহমেদের আর অ্যাপার্টমেন্ট কেনা হয়নি। অনেক বলে কয়ে, একে ওকে ধরে এতিমখানার জমিটা জলিল সাহেব কিনে নিয়েছে। লটারির টাকায় জমির মূল্য পুরো শোধ হয়নি। বাকিটা বছর বছর দিতে হবে।

আগের অরফানেজটার পাশে আরেকটা বড়ো কাঠের বাড়ি বানানো হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে বৃক্ষ সদন। বাকি জমি জুড়ে লাগানো হয়েছিল নানা জাতের বৃক্ষ আর লতাগুল্ম, পুরো জায়গার নাম দেওয়া হয়েছে বনভূমি। বৃক্ষসদন, বনভূমি একসঙ্গে চালু হয়েছে এখন দু'বছর হলো। কয়েকশ' বিরল প্রজাতির সবুজ বৃক্ষের মাঝে এই বৃক্ষসদন মিহিরসহ আরো অনেক ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের আনন্দ-বেদনা আর রাগ-অভিমানে প্রাণময় হয়ে উঠেছে।

বিদেশি পত্রিকায় জলিল আহমেদের এই উদ্যোগের খবর প্রচার হবার পর অনেকেই আগ্রহ দেখিয়েছে। বাইরে থেকে প্রচুর ডোনেশন আসছে। জলিল আহমেদ চাকরি ছেড়ে দিয়ে বৃক্ষসদনের সার্বক্ষণিক ভার নিয়েছে। সঙ্গে যোগ দিয়েছে মুস্তফা, রুমি আর ফিরোজ।

এলাকার লোকজন একটা আশ্চর্য ব্যাপার খেয়াল করেছে জুলাইয়ের কাঠফাটা গরমে যখন ঢাকা শহরের তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায়, তখন এই এলাকার তাপমাত্রা থাকে পঁচিশ-ছাব্বিশ ডিগ্রি। পরিবেশ বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা এটা নিয়ে কেউ স্টাডি করেছে মাসখানেক আগে। ওরা বলছে এটা নাকি বনভূমির প্রভাব।

আরেকটা ব্যাপার এখানে প্রচুর গাছপালা থাকায় বনভূমিতে নানারকম পাখির সমাবেশ ঘটেছে। বনভূমির মাঝে যে ছোটো জলাধার বানানো হয়েছে, সেখানে শীতকালে যোগ হয় ঝাঁকে ঝাঁকে বিদেশি পাখি। বনভূমি জুড়ে কিচিরমিচির উৎসব লেগে যায়। এই পুরো ব্যাপারটাকে নাকি বলে প্রাণ-বৈচিত্র্য।

রঞ্জু ভাবে ইস সারা পৃথিবীটা যদি এমন বনভূমি হয়ে উঠত। ■

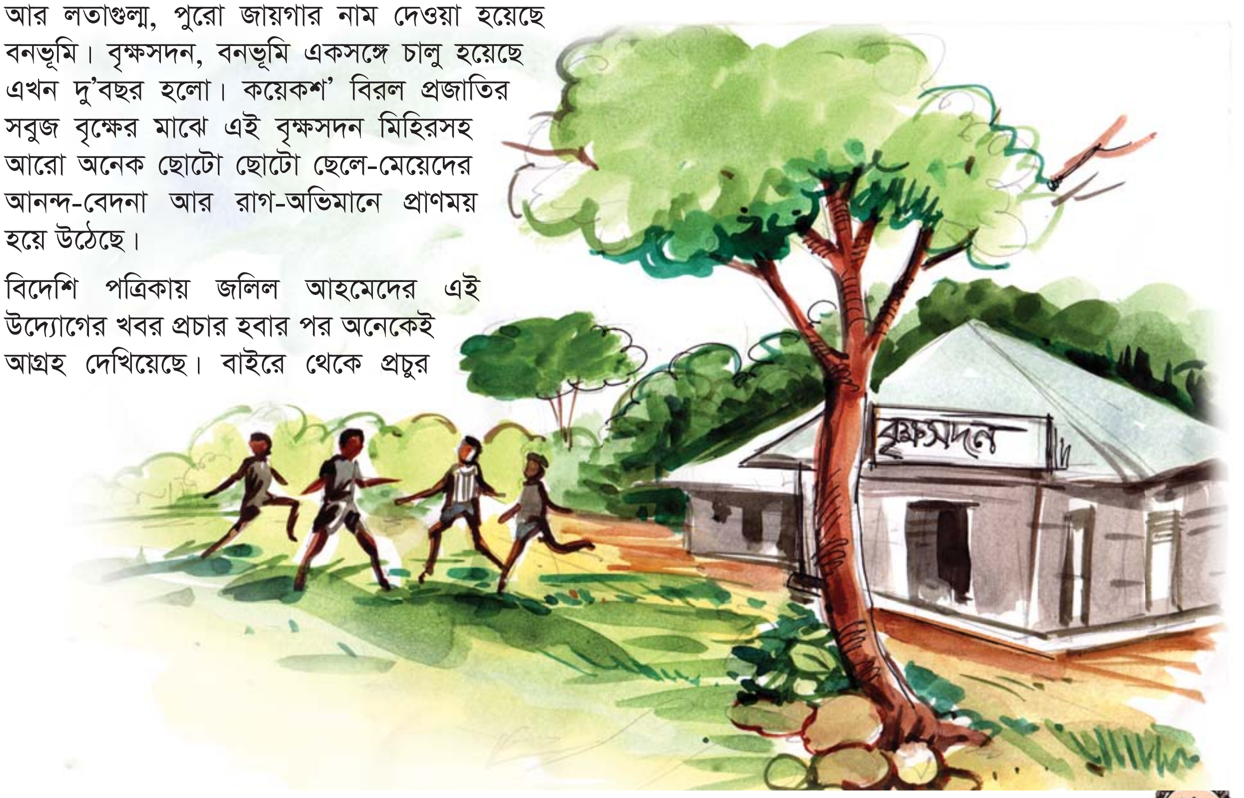

তোমাদের জন্য শান্তা ক্লজের ছবিটা এঁকেছে অর্পিতা রায় বর্মণ, ও পড়ে, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে, চতুর্থ শ্রেণিতে

শুভ বড়ো দিন

মেজবাউল হক

পঁচিশে ডিসেম্বর। শুভ বড়োদিন। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসবের দিন। এই দিনে বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করেন খ্রিষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশুখ্রিষ্ট। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে শান্তির বাণী ছড়িয়ে দেওয়া, মানব জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করা এবং সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রচার করতে তাঁর আগমন ঘটেছিল।

বিশ্বের অন্য দেশের মতো বাংলাদেশের খ্রিষ্ট ধর্মানুসারীরাও যথাযথ ধর্মীয় আচার, আনন্দ-উৎসব ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ক্রিসমাস ট্রি সাজিয়ে, কেক তৈরি করে ও মোমবাতি জ্বালিয়ে দিনটি উদযাপন করে। সান্তা ক্লজ শিশুদের মধ্যে উপহার সামগ্রী বিনিময়ের মাধ্যমে আনন্দে ভরিয়ে তুলেন দিনটি।

দেশের সব গির্জা ও এর আশপাশে রঙিন বাতি জ্বালিয়ে সাজানো হয় ক্রিসমাস ট্রি। বড়োদিন উপলক্ষে গির্জার মূল ফটকের বাইরে বসে মেলা।

স্বাগতম ২০১৯

বন্ধুরা, বিদায় ২০১৮, স্বাগত জানাই ২০১৯ সালকে। নতুন স্বপ্ন আর সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু হচ্ছে নতুন বছরের। নতুন বছরে দারুণ কিছু অর্জন, সৃষ্টি আর কল্যাণে ভরে উঠবে আগামীর জীবন– এই প্রত্যাশা আমাদের সকলের। বন্ধুরা, তোমরাও এরইমধ্যে একটি ক্লাস শেষ করে প্রস্তুত হচ্ছ আরেকটি ক্লাসের জন্য। মাতবে নতুন বইয়ের নতুন গন্ধে।

৩১শে ডিসেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব দেশে উৎসাহ-উদ্দীপনায় নববর্ষের প্রথম দিনটি উদযাপিত হয়। এই বিশেষ দিনটিতে বিভিন্ন খুদে বার্তা ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। ছোট্ট বন্ধুরা, এই দিনটিতে পুরনো বছরের ভুলগুলো শুধরে ভালো শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সুন্দর আগামীর লক্ষ্যে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এ জন্য পড়ালেখা থেকে শুরু করে সব বিষয়ে আগামী বছরের জন্য নিতে পারো নতুন পরিকল্পনা। কী করবে বা করবে না, তা লিখে নিতে পারো একটি ডায়রিতে। পরিকল্পনায় নিতে পারো ভালো কিছু কাজ করার নতুন চিন্তাভাবনা। আরো মনে রাখবে, নববর্ষ অনুষ্ঠানে যাতে অপ্রীতিকর কিছু না ঘটে। সে জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঠিক নিয়ম মেনে নববর্ষ উদ্‌যাপন করতে হবে। রাস্তায় বা বাড়ির ছাদে উচ্চ আওয়াজে গান বাজনা থেকে বিরত থাকতে হবে। আমরা আশা করি একটি সুন্দর আগামীর বাংলাদেশের। সেই প্রত্যাশা নিয়ে সবাইকে জানাচ্ছি ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ■

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

এ মাসের শব্দ ধাঁধা

পাশাপাশি: ৪.কুমিল্লা জেলার একটি ঐতিহাসিক স্থান, ৬. বাগান, ৮. নিজের অহংকার, ১০. ক্রিকেট খেলার একটি সরঞ্জাম, ১১. বাংলাদেশের রাজধানী, ১২. নিঃস্ব

উপর-নিচ: ১. বক, ২. ধানের একটি প্রজাতি, ৩. স্বামী, ৫. সাজানো/ বানানো, ৭. মাশরাফি বিন মুর্তজা যে জেলায় জন্ম নিয়েছেন, ৮.নিমন্ত্রণ, ৯.মানদণ্ড, ১০.তুষার

১		২				৩	
		৪			৫		
৬	৭						
			৮				৯
১০						১১	
১২							

এ মাসের ব্রেইন ইকুয়েশন

৪	/		+	২	=	
*		*		+		+
	*	৩	-		=	৫
-		+		+		-
৫	+		-	২	=	
=		=		=		=
	*	৪	-		=	৭

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

গত সংখ্যার শব্দ ধাঁধার সমাধান

সু	না	ম	গ	ঞ্জ		প	টু
ন্দ		য়				র্য	
র		ম	ং	লা		ট	
ব	চ	ন		গা	য়	ক	
ন		সি		ম			গু
	হি	ং	সা		স	কা	ল
		হ					ট্রা
					সা	লা	ম

গত সংখ্যার ব্রেইন ইকুয়েশনের সমাধান

৩	×	৪	-	৫	=	৭
+		×		+		-
৮	÷	২	+	১	=	৫
÷		-		-		+
২	×	৫	-	৪	=	৬
=		=		=		=
৭	+	৩	-	২	=	৮

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই ০১৫৩১৩৮৫১৭৫ বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-43, No- 6, December 2018, Tk-20.00

তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ, ২য় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা